প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

এপ্রিলের উজ্জ্বল ঠাণ্ডা দিন। ঘড়িগুলো একটার কাঁটায় ঘণ্টা পেটাচ্ছে। থুতুনি বুকে ঠেসে হিম হাওয়ার কবল থেকে মুখমণ্ডলটা বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে ভিক্টরি ম্যানশন্সের কাঁচের দরোজা ঠেলে নিজেকে ভিতরে গলিয়ে দিলো উইনস্টন স্মিথ। সুযোগ মতো গাদাখানেক ধুলিও ঘূর্ণি খেয়ে ঢুকলো। চট করে ঢুকে পড়েও ওদের আটকাতে পারলো না উইনস্টন।

হলওয়েতে পা ফেলতেই নাক ভরে গেলো সিদ্ধ বাঁধাকপি আর ছাতরাপড়া পুরনো মাদুরের গন্ধে। একদিকের দেয়ালে বেঢপ একটা রঙিন পোস্টার সাঁটা। তাতে এক মিটারের বেশি চওড়া আরও বেঢপ আকৃতির এক মানব মুখ। ৪৫ বছর বয়স হতে পারে এমন এক পুরুষের প্রতিকৃতি। বড় কালো গোঁফ জোড়ায় বেজায় দশাসই লাগে।

লিফটের চেষ্টা বৃথা, তাই সিঁড়ির দিকেই পা বাড়ালো উইনস্টন। খুব প্রয়োজনেও কদাচই কাজ করে এই লিফট। আর এখনতো দিনের আলোয় বিদ্যুতের লাইন কাটা। মূলত ‘ঘৃণা সপ্তাহ’র অর্থনৈতিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে চলছে বিদ্যুত সাশ্রয়। সাত তলার ফ্ল্যাট। ঊনচল্লিশের শরীর আর ডান গোঁড়ালির উপরে কুষ্ঠের ঘা নিয়ে একটু ধীরে ধীরেই সিঁড়ি ভাঙতে হচ্ছে উইনস্টনকে। একটু পর পর জিরিয়েও নিচ্ছে। প্রতি তলায় লিফটের উল্টোদিকের দেয়াল থেকে সেই একই বেঢপ পোস্টার থেকে একই বেঢপ প্রতিকৃতি চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে। মনে হবে প্রতিটি তলায় বসে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, কি করছেন তার ওপর নজর রাখছে। মনে কেন হবে? লিখেই দেওয়া আছে ছবির ক্যাপশানে- ‘বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ’।

সাত তলায় ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে ভিতর থেকে কানে এলো একটি ভরাট কণ্ঠ । সে কণ্ঠ আউড়ে চলেছে কতগুলোর নাম। ওগুলো লোহা উৎপাদনকারীদের নাম। লম্বাটে ধাতব পাতের মতো দেখতে ম্যাটমেটে একটা কাঁচের ভেতর থেকে ওই কণ্ঠধ্বনি বের হচ্ছে। বস্তুটি ডান দিকের দেয়ালে লটকানো । উইনস্টন সুইচ ঘোরালে কণ্ঠটা একটু দমে এসে সামান্য কানসওয়া হলো। বস্তুটির (বলা হয় টেলিস্ক্রিন) পর্দা আরও ঝাপসা হলো বটে, তবে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলো না। জানালার দিকে এগোলো সে। ছোট, শীর্ণকায় দেহখানি নীলরঙা ওভারঅলে বাড়তি কোনো ভাব প্রকাশ করে না। ওটি দলের ইউনিফর্ম। চুলগুলো ধূসর, চেহারায় কাঠিন্যের একটা ছাপ আছে বটে, তবে নিম্নমানের সাবান, ভোতা রেজরব্লেডের ব্যবহার আর সদ্যসমাপ্ত শীতের প্রকোপে মুখের ত্বক ভীষণ খসখসে।

ঝাপসা কাচের জানালার মধ্য দিয়ে যতটুকু আঁচ করা যায়, তাতে মনে হয় বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। নিচের রাস্তায় ছোট ছোট ঘুর্ণি বাতাসে ধুলো আর ছেঁড়া কাগজগুলো ঘুরে ঘুরে উড়ছে। কড়া রোদ আর নীল আকাশও কোনও কিছুকে রঙিন করে তুলতে পারেনি। কেবল এখানে ওখানে সেঁটে রাখা পোস্টারগুলোই তার প্রকট রঙ ছড়িয়ে চলেছে।

কালো গোঁফওয়ালা চেহারাটি কোনায় কোনায় তার উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। ঠিক উল্টোদিকের বাড়ির সামনেও একটি পোস্টার সাঁটা। ক্যাপশানে বলা আছে- ‘বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ’। আর তার কালো চোখ দুটো যেনো পাকিয়ে পাকিয়ে ঢুকছে উইনস্টনের চোখের গভীরে।

সড়কের একদিকে কোনার দিকটা ছিঁড়ে ঝুলে থাকা আরেকটি পোস্টার দৃষ্টিতে আটকালো তার। ছেঁড়া অংশটুকু বাতাসের ঝাপটায় নড়ছে। এতে পোস্টারের ‘ইংসক’ শব্দটি একবার ঢাকা পড়ছিলো আবার দেখা যাচ্ছিলো। বেশ খানিকটা দূরে একটি হেলিকপ্টার দুই ছাদের মাঝখান দিয়ে নিচের দিকে নেমে এলো। এরপর একটি বাঁক নিয়ে আবার উড়ে গেলো। ওটি পুলিশের টহল হেলিকপ্টার। মানুষের বাড়িতে বাড়িতে জানালাপথে চোখ ফেলে নজরদারি চালাচ্ছে। এমন টহল এখন আর কোনও বিষয়ই নয়, তবে ‘থট পুলিশ’আদতেই একটা বিষয়।

উইনস্টনের পেছনটাতে টেলিস্ক্রিন তখনও লোহা উৎপাদন আর সরকারের নবম ত্রি-বার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে বকবক করে যাচ্ছে। এই টেলিস্ক্রিন একইসঙ্গে শব্দ ধারণ ও সম্প্রচার দুইই করে। খুব আস্তে ফিসফিসে আওয়াজ ছাড়া সামান্য জোরে শব্দ করলেই ওই যন্ত্র তা ধারণ করে নেবে, আর ধাতব পাতের মতো দেখতে যন্ত্রটির নির্ধারিত দৃষ্টিসীমার মধ্যে পড়ে গেলে ধারণ করা হয়ে যাবে চেহারা। সামান্য শব্দ করলে তা শোনা যাবে। তবে এটা বোঝার উপায় মাত্রও নেই ঠিক কোন মূহূর্তে আপনি সে দৃষ্টিসীমায় পড়বেন। কতবার কোন পদ্ধতিতে ‘থট পুলিশ’ ঢুকে পড়বে আপনার চৌহদ্দিতে তা আন্দাজ করা কঠিন।

ওরা আপনাকে সারাক্ষণ নজরদারিতে রাখছে-সেটুকুও হয়তো মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু যখন তখন চাইলেই যে ওরা আপনার ওয়্যার সিস্টেমে ঢুকে পড়ছে! আপনাকে এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করতে হচ্ছে যেখানে টু- শব্দটি করলেও তা অন্য কেউ শুনে ফেলছে আর ঘন ঘুটঘুটে অন্ধকার না হলে আপনার প্রতিটি নড়াচড়াও ওরা দেখে ফেলছে।

টেলিস্ক্রিনের দিকে পীঠ রেখে দাঁড়ালো উইনস্টন। এটাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। যদিও সে ভালো করেই জানে পেছনের দিক থেকে তাকে চিনে ফেলা কঠিন কিছু নয়।

সত্য মন্ত্রণালয় (মিনিস্ট্রি অব ট্রুথ) এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে। ওখানেই কাজ করে উইনস্টন। বিধ্বস্ত দৃশ্যপটে একটা সাদা রঙের উঁচু ভবন। এটাই! বিস্বাদ লাগার মতো একটি অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে উইনস্টনের চোখে মুখে, আর মনে মনে বলে, এটাই লন্ডন, প্রধান নগর এয়ারস্ট্রিপ ওয়ানের। যেটি আবার ওশেনিয়ার তৃতীয়-বৃহত্তম জনবহুল প্রদেশও বটে। ছেলেবেলার কিছু স্মৃতি হাতড়ে উইনস্টন বোঝার চেষ্টা করলো লন্ডন কি আগেও ঠিক এমনটাই ছিলো? এই যে উনবিংশ-শতাব্দীর পচাগলা বাড়িগুলো, কাঠের বেড়া, কার্ডবোডে ঘেরা জানালা, ঢেউটিনের ছাদ আর বাগানের অবিন্যস্ত দেয়াল- আগেও কি এমনটাই ছিলো? আর বোমা পড়া স্থানগুলো! যেখানে পলেস্তারার ধুলোগুলো বাতাসের সাথে মিশে উড়ছে সারাক্ষণ, আর উইলো গাছের অঙ্কুরগুলো, পাথরের স্তুপের মাঝ থেকে উঁকি দেওয়ার অক্লান্ত কসরত করে যাচ্ছে, সেসব স্থানে বোমা পড়ে বড় বড় গর্ত হয়ে আছে, আর ঠিক মুরগীর খাঁচার মতো ছোট ছোট কাঠের নোংরা কলোনিগুলোতে গড়ে উঠেছে আবাসন? এসব ভেবে খুব একটা ফায়দা হলো না তার। উইনস্টন কিছুই মনে করতে পারলো না। পেছনে দৃশ্যপটহীন, অর্থহীন স্রেফ কিছু উজ্জ্বল আলোকিত আলোকচিত্র ছাড়া শিশুবেলার আর কিছুই মনে পড়ে না তার।

মিনিস্ট্রি অব ট্রুথ। নিউস্পিকে যার সংক্ষিপ্ত রূপ মিনিট্রু (নিউস্পিক ওশেনিয়ার দাপ্তরিক ভাষা)। আশেপাশে চোখে পড়ে এমন অন্য যে কোনো বস্তুর চেয়ে ভিন্ন গড়নের। ঝকঝকে সাদা কংক্রিটে পিরামিড কাঠামোয় তৈরি ৩০০ ফুট উঁচু ভবনটি। উইনস্টন এখন ঠিক যেখানটাতে দাঁড়িয়ে সেখান থেকেও ওই ভবনের সামনে জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা তিনটি স্লোগান স্পষ্ট পড়ে নেওয়া যাচ্ছে-

যুদ্ধই শান্তি স্বাধীনতা দাসত্ব অজ্ঞতাই শক্তি

সত্য মন্ত্রণালয়ের নীচ তলার ওপরের অংশে তিন হাজার কক্ষ, এমনটাই বলা হয়। আর নিচেও তার কক্ষ সমান সংখ্যক । গোটা লন্ডনে একই গঠন ও আকৃতি আরও তিনটি ভবন রয়েছে। ভিক্টরি ম্যানশন্সের ছাদ থেকে তাকালে আশেপাশের স্থাপনাগুলোকে ক্ষুদ্রাকায় করে দিয়ে ওই চারটি ভবনই একসঙ্গে চোখে পড়ে। চার ভবনে চারটি মন্ত্রণালয়। আর পুরো সরকারও এই প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত। সত্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংবাদ, বিনোদন, শিক্ষা ও চারুকলা। মিনিস্ট্রি অব পিস বা শান্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেবলই যুদ্ধ। মিনিস্ট্রি অব লাভ বা ভালোবাসা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আইন-শৃংখলা। আর মিনিস্ট্রি অব প্লেন্টি বা প্রাচুর্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্থ সম্পর্কিত বিষয়। নিউস্পিকের ভাষায় এগুলো সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে পরিচিতি পেয়েছে- মিনিট্রু, মিনিপিস, মিনিলাভ ও মিনিপ্লেন্টি নামে।

ভালোবাসা মন্ত্রণালয় সাক্ষাৎ এক ভীতির নাম। এই মন্ত্রণালয়ের ভবনে একটি জানালাও নেই। উইনস্টন এই মন্ত্রণালয়ে কখনোই ঢোকেনি, এমনকি এর চৌদিকে আধা কিলোমিটারের মধ্যেও যায়নি। দাপ্তরিক কাজ ছাড়া এখানে অবশ্য ঢোকাও যায় না। আর যদি যেতেই হয় তো কাঁটাতারে ঘেরা সরু পথ বেয়ে ইস্পাতের দরজা পথে লুকোনো মেশিন গানের নলের সামনে দিয়ে ঢুকতে হবে। এমনকি যে সড়ক দিয়ে এতসব বাধার মুখে গিয়ে পড়তে হবে তাতেও দেখা যাবে গরিলামুখো পাহারাদাররা কালো পোশাকে অস্ত্র আর মোটা বেত হাতে টহল দিচ্ছে।

হঠাৎই উল্টো ঘুরলো উইনস্টন। ততক্ষণে মুখমণ্ডলে আশাবাদীতার একটি অভিব্যক্তি সে মেখে নিয়েছে। টেলিস্ক্রিনের সামনে দাঁড়ানোর বেলায় উপদেশ এমনটাই। কক্ষ ছেড়ে সোজা ঢুকে পড়লো ছোট্ট রান্নাঘরে। দিনের এই সময়টাতে মন্ত্রণালয় থেকে বাইরে থাকায় ক্যান্টিনে তার জন্য বরাদ্দ দুপুরের খাবার নষ্ট হলো। সে ভালো করেই জানতো রান্নাঘরে বড় এক টুকরো কালচে রুটি ছাড়া আর কিছুই নেই। আর সে রুটিও পরের দিনের নাস্তার জন্য বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তাক থেকে বর্ণহীন পানীয়র একটি বোতল নামিয়ে আনলো। সাদা লেবেলে লেখা ‘ভিক্টরি জিন’। একটা অস্বস্তিকর, তেলচিটচিটে গন্ধ নাকে লাগলো- চীনাদের চাল থেকে স্প্রিটের যে গন্ধটি বের হয় ঠিক তেমন। এককাপ পরিমান পানীয় গলায় ঢেলে, একটি ঝাঁকি সহ্য করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে, ঢক করে পেটে চালান করে দিলো উইনস্টন।

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ লালচে হয়ে উঠলো, চোখ দিয়ে পানি ছুটলো। জিনিষটি মনে হলো নাইট্রিক এসিড বা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু। এটি পেটে গেলে মনে হবে মাথার পেছনের দিকটাতে কেউ রাবারের লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে। পরের মূহূর্তেই পাকস্থলীর আগুন কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলে পৃথিবীকে আবার ছন্দ-আনন্দময় মনে হতে থাকবে। এবার ভিক্টরি সিগারেট লেখা কুঁচকে যাওয়া একটি প্যাকেট থেকে একটি শলাকা বের করলো উইনস্টন। কিন্তু অসচেতনতায় এর উপরের দিকটা উল্টো করে ধরায় তামাকগুলো নিমিষেই মেঝেতে পড়ে গেলো। পরের সিগারেটটি বের করে সতর্কভাবে হাতে নিয়ে লিভিং রুমে ফিরলো। টেলিস্ক্রিনের বাম দিকে পেতে রাখা ছোট্ট টেবিলটির ওপর বসলো। ড্রয়ার টেনে প্রথমেই বের করলো একটি কলমদানি। এরপর বের করে আনলো কালির দোয়াত আর মোটা কোয়ার্টো সাইজের নোটবুকটি। এর পেছনটা লাল আর কভারটি মারবেল রঙের।

লিভিং রুমে টেলিস্ক্রিন বসানো জায়গাটি কিছুটা অস্বাভাবিক। শেষ দেয়ালে বসালে গোটা রুমই এর আওতায় আসতো, কিন্তু এটি বসানো হয়েছে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দেয়ালটির ওপর, ঠিক জানালার উল্টোদিকে। এতে একদিকে স্ক্রিনের চোখ এড়িয়ে একটি চোরকুঠুরি তৈরি হয়েছে, আর ঠিক সেখানটিতেই এখন বসে আছে উইনস্টন। হতে পারে ফ্ল্যাটগুলো

বানানোর সময় এই অংশটিকে বুক শেল্ফের জন্য ভাবা হয়েছিলো। চোরকুঠুরিতে বসে উইনস্টন তখন টেলিস্ক্রিনের চোখের বাইরে। কোনো শব্দ করলে তা শোনা যাবে কিন্তু যতক্ষণ এখানে বসে থাকবে তাকে দেখা যাবে না। এমনই একটি অবস্থায় ঠিক যে কাজটি করতে সে যাচ্ছে সেটি করার জন্য অংশত কক্ষের ওই ভৌগলিক আকার-প্রকৃতিই তাকে উৎসাহিত করেছে।

অথবা হতে পারে ড্রয়ার টেনে এইমাত্র যে নোটবুকটি বের করে আনলো সেটিই এর কারণ। নোটবুকটি অদ্ভুত রকমের সুন্দর। এর পাতাগুলো মসৃণ ক্রিমের মতো। অনেক দিনের পুরোনো বলে কিছুটা হলদেটে। আর এরকম কাগজতো গত চল্লিশ বছর ধরে তৈরিই হচ্ছে না। উইনস্টন অনুমান করতে পারে, নোটবুকটি চল্লিশ বছরেরও বেশি পুরোনো হবে। শহরের বস্তির মতো একটি এলাকায় পুঁতিগন্ধময় ভাঙারির দোকানের জানালা পথে প্রথম তার চোখে পড়ে নোটবুকটি। দেখেই ওটি পাবার ভীষণ ইচ্ছা হয় উইনস্টনের। দলের সদস্যদের সাধারণ দোকানে যাওয়ায় বারণ আছে। তবে সে যে খুব কড়াকড়িভাবে মানা হয়, তা নয়। বেশ কিছু দ্রব্য-সামগ্রী রয়েছে, যেমন জুতোর ফিতে, রেজর ব্লেড এগুলো ওসব দোকানেই মেলে। রাস্তায় এদিক-ওদিক, মাথাটি ঘুরিয়ে খুব দ্রুত দেখে নিলো উইনস্টন। সুযোগ বুঝে আলগোছে ঢুকে পড়লো দোকানের ভেতরে আর আড়াই ডলার দিয়ে চট করে নোটবুকটি কিনেও ফেললো। ওই সময় উইনস্টনের মাথায় এটি কেনার পেছনে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য কাজ করেনি। অনেকটা অপরাধীর মতোই নোটবুকটি ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে বাড়িতে ফেরে সে। এরপর একটি আঁচড়ও এতে কাটা হয়নি। এ যেনো তার অনেক আপস করে পাওয়া এক সম্পত্তি।

এখন উইনস্টন ঠিক যে কাজটি করতে যাচ্ছে তা হচ্ছে- ডায়রি লেখা শুরু করা। কাজটি অবৈধ নয়। (আসলে কোনও কাজই অবৈধ না কারণ আইনই নেই।) তবে এটা সত্য একবার ধরা পড়ে গেলে সাজাটা বেজায় বড়- হয় মৃত্যুদণ্ড, নয়তো শ্রমদাসদের ক্যাম্পে কম করে হলেও ২৫ বছরের বাস। উইনস্টন কলমদানিতে একটি নিব বসিয়ে তাতে চুষুনি টিপে কালি তুলে নিলো। কালির কলম এখন সেকেলে। এর ব্যবহার বলতে গেলে উঠেই গেছে। সই দিতেও এখন কলমের ব্যবহার কদাচই দেখা যায়। উইনস্টন কিন্তু এরই মধ্যে স্রেফ ওই নোটবুকটিতে লেখার জন্যই একটি কলম কিনে ফেলেছে। তার মন বলছিলো, অমন সুন্দর ক্রিমের মতো মসৃণ পাতাগুলোতে আঁচড় কাঁটতে একটি সত্যিকারের নিবের কলমই যথার্থ। ইঙ্ক-পেন্সিল দিয়ে দিয়ে এই অমূল্য পাতায় ঘষাঘষি করার ইচ্ছা তার মোটেই ছিলো না।

হাতে লেখায় অভ্যস্ত ছিলো না উইনস্টন। দুই-একটি ছোটখাটো নোট লেখা ছাড়া আজকাল স্পিক-রাইট পদ্ধতিরই ব্যবহার চলে। তবে ঠিক এই মূহূর্তে সে প্রক্রিয়া কোনো কাজে দেবে না। কলমটি কালির দোয়াতে চুবিয়ে এক সেকেন্ডের জন্য দমে গেলো সে। গোটা শরীরের ভেতরটা একটা

ঝাঁকুনি খেলো। কাগজের ওপর দাগ কাঁটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বটে। আর এক্ষণে সেই কাজটাই করলো। ছোট ছোট প্যাচের অক্ষরে সে লিখলো-

৪ঠা এপ্রিল ১৯৮৪।

পীঠে হেলান দিয়ে বসলো উইনস্টন। পুরোপুরি অসহায়ত্বের অনুভব ভর করলো তার ওপর। শুরুতো হলো, কিন্তু মোটে নিশ্চিতই হতে পারছিলো না- এটা ১৯৮৪ সাল তো! স্পষ্ট করেই জানে তার বয়স এখন ঊনচল্লিশ। ১৯৪৪ অথবা ১৯৪৫ এর কোনো একটি দিনে তার জন্ম। কিন্তু গত এক বা দুই বছরে একটি বারের জন্যও কোথাও, কখনো কোনও তারিখ তাকে লিখতে হয়নি। এতে যেনো সালটাই ভুলে বসে আছে সে।

এবার নতুন আরেকটি ভাবনা ভর করলো- কার জন্য এই ডায়রি লিখছে সে? ভবিষ্যতের জন্য, অনাগত প্রজন্মের জন্য। নোটবুকের পাতার ওপর লেখা অনিশ্চিত তারিখটির চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরপাক খেতে থাকে, আর মাথায় আসে নিউস্পিকের একটি শব্দ ‘ডাবলথিঙ্ক’ (দ্বৈতচিন্তা)। এই প্রথমবারের মতো তার মনে হলো যা সে করতে যাচ্ছে, তা সে বুঝতে পারছে না। ভবিষ্যতের সঙ্গে আপনি কিভাবে যোগাযোগ করবেন? এটি প্রকৃতিগতভাবেই অসম্ভব। ভবিষ্যততো বর্তমানেরই সন্নিবেশ; তা যদি হয়, তাকে কথা শোনানো দায়; আর হতে পারে ভবিষ্যত বর্তমানের চেয়ে ভিন্ন কিছু; তাহলে এই যোগাযোগের প্রচেষ্টাই বৃথা।

কিছুটা সময় কাগজের দিকে বোকার মতো চোখ ফেলে বসে থাকলো। টেলিস্ক্রিনে ততক্ষণে উচ্চস্বরে সামরিক সঙ্গীত বাজতে শুরু করেছে। উইনস্টন বুঝতে পারছিলো না, সে কি নিজেকে ব্যক্ত করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, নাকি যা কিছু সে লিখতে চেয়েছিলো তা সব ভুলে গেছে। গত কটি সপ্তাহ ধরে ঠিক এই মূহূর্তটির জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করছিলো। আর তার মন থেকে এই কথাটি একবারের মতোও আলাদা হয়নি যে, এজন্য তার আর কিছুই না, কেবল সাহসের প্রয়োজন। মূল লেখার কাজটি খুব যে কঠিন হবে তা নয়। তাকে একটি কাজই করতে হবে- বছরের পর বছর ধরে সারাক্ষণ মাথার ভিতর যা কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে, সেসবই কলমের নিব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাগজে চালান করে দিতে। কিন্তু এই মুহূর্তে যেনো সবকিছুই উবে গেছে। উপরন্তু পায়ের গোড়ালির উপরের ঘাঁয়ের জায়গাটিতে একটু বাড়াবাড়ি রকমের অসহনীয় চুলকানি অনুভূত হচ্ছে। তবে চুলকানোর সাহস করলো না সে। কারণ যখনই চুলকায় তখনই জায়গাটি ভীষণ জ্বলতে থাকে। টিক টিক করে একেকটি সেকেন্ড বয়ে যাচ্ছে। এ মূহূর্তে সামনে কাগজের শূন্য পাতা ছাড়া যেনো আর কিছুই তার অনুভূতিতে নেই। এমনকি গোড়ালির ওপরের ঘাঁ, টেলিস্ক্রিনের বাজনা আর জিনের মদিরায় সামান্য বুঁদ হয়ে থাকার ভাবটুকুও যেনো হারিয়ে গেছে।

ভীষণ আতঙ্ক নিয়ে, যা কিছু মনোস্থির করছিলো সেগুলো সম্পর্কে ভুল সচেতনতায় এবার আচমকা লেখা শুরু করলো সে। তার ছোট ছোট, অথচ শিশুসুলভ হাতের লেখাগুলো নোটবুকের পাতায় উপর-নিচ করে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। তাতে বাক্যের শুরুতে ক্যাপিটাল লেটার কিংবা বাক্যের শেষে ফুলস্টপ ব্যবহারের বালাই থাকলো না।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৮৪। গত রাতটি ছিলো সিনেমার। সবই যেনো যুদ্ধের ছায়াছবি। সবচেয়ে সেরা ছিলো ভূমধ্যসাগরের কোনো এক স্থানে উদ্বাস্তুবোঝাই একটি জাহাজে বোমা ফেলার দৃশ্যটি। আর দর্শকরা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশি মজা পেয়েছে ওই দৃশ্যে, যাতে মোটাসোটা একটি লোক অসীম সাগরেই সাঁতরে হয়েছিলো পলায়নপর আর তার পিছু নিয়েছিলো একটি হেলিকপ্টার। প্রথম দেখা গেলো লোকটি শুশুকের মতো ডুবছে আর ভেসে উঠছে। এরপর তাকে দেখা গেলো হেলিকপ্টার থেকে ছোঁড়া গুলির ঝাঁকের ঠিক মাঝখানে। তার চারিদিকের পানিতে আছড়ে পড়া গুলির তোড়ে তৈরি গর্তগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ছিলো। পরক্ষণেই চারিদিকে পানি গোলাপি হয়ে উঠলো আর তখনই লোকটি ডুবেও গেলো। এতই দ্রুত যে তখনও গুলির তোড়ে সৃষ্ট গর্তগুলো পানিতে ভরে উঠতে পারেনি। আর যখন লোকটি ডুবে যাচ্ছিলো তখন দর্শকরা ছোটাচ্ছিলো হাসির ফল্গুধারা। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিলো কেউ কেউ। একটু পর সবাই দেখলো বোঝাই করা নারী আর শিশু নিয়ে ভাসছে একটি লাইফবোট। বোটের উপর দিয়ে একটি হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। ওদের মধ্যে, ইহুদিই হবেন, এক মধ্যবয়সী নারীকে দেখা গেলো অনেকটা ঝুঁকে বসে আছেন। কোলে বছর তিনেকের একটি ছেলে। ছোট্ট শিশুটি ভয়ে চিৎকার করছে আর নারীটির বুকের মধ্যে মাথা লুকোচ্ছে। মনে হচ্ছিলো ও যেনো ওখান দিয়েই ভেতরে ঢুকে যেতে চায়। শিশুটিকে জাপটে ধরে ওকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন নারীটি। যদিও তিনি নিজেও তখন ভয়ে নীল হয়ে আছেন। তারপরেও ছেলেটিকে এমনভাবে আগলে ধরেছিলেন যেনো তার বাহুই ওকে বোমার আঘাত থেকে বাঁচাবে। আর ঠিক তখনই হেলিকপ্টার থেকে ২০ কিলো সাইজের একটি বোমা পড়লো ওদের ঠিক মাঝখানে। এক ভয়াবহ ঝলকানি দিয়ে সেটি বিষ্ফোরিত হলো। নৌকাটি চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে দেয়াশলাইয়ের কাঠির মতো ছিটকে গেলো চারিদিকে। সবার চোখে পড়লো এক অসাধারণ দৃশ্য! একটি শিশুর হাত ছিটকে উপর থেকে আরও উপরে উঠছে আর হেলিকপ্টারের নাকে লাগানো ক্যামেরায় তা ধরা পড়েছে। দলের বিভিন্ন আসন থেকে দর্শকরা হাসির হল্লা ছুটালো কেবল এক জন নারী ছিলেন ব্যাতিক্রম। ওই কক্ষে প্রোলদের (ওসেনিয়ার কর্মজীবী শ্রেণি) অংশের প্রতিনিধি তিনি। ক্রোধে উত্তেজনায় পা ছুঁড়তে লাগলেন নারীটি। আর চিৎকার করে বলতে লাগলেন, শিশুদের সামনে এগুলো কীসব দেখানো হচ্ছে, শিশুদের সামনে এগুলো দেখানোর অধিকার কারো নেই। পুলিশ ছুটে এসে নারীটিকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেলো। অন্যদের অভিব্যক্তিতে মনে হলো না কিছু একটা ঘটেছে। কেউই আসলে

একজন প্রোল কি বললো না বললো, তার কি হলো, না হলো তাতে পাত্তা দেয় না। এটা প্রোলদের গতানুগতিক প্রতিক্রিয়া। ওরা কখনোই…

উইনস্টন লেখা থামালো। অংশত এই কারণে যে, ব্যাথায় তার পা টনটন করেছে। বুঝতে পারছে না ঠিক কী তাকে এই আবর্জনার স্রোতে টেনে এনে ফেলেছে।

তবে কৌতুক আর কৌতুহলের বিষয় হলো- সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন স্মৃতি তার মনের কোণে স্পষ্ট হয়ে ওঠার কারণেই কাজটিতে সে হাত দিয়েছে। ভাবনাটি তার মনকে ঠেলে ঠেলে এমন একটি স্থানে নিয়ে ঠেকিয়েছে যে সে মনে করছে এগুলো লিখে ফেলা জরুরি। কিন্তু একথা ভাবতে ভাবতেই তার মস্তিষ্ক বলতে লাগলো অন্য কথা। মস্তিষ্ক এখন বলছে- সেই স্মৃতি নয়, বস্তুত অপর একটি ঘটনা এই লিখতে বসার কারণ। যে ঘটনাটি তাকে এই ভর দুপুরে ঘরে ঠেলে পাঠিয়েছে; আর আজই ডায়রি লেখা শুরু করতেও বাধ্য করেছে।

এমন একটি অতি অস্পষ্ট বিষয়কে যদি আদৌ কোনো ঘটনা কিংবা বিষয় বলা চলে তাহলে তা ঘটেছে ওইদিন সকালেই, মন্ত্রণালয়ে।

তখন বেলা এগারোটার কাছাকাছি। সবাই বেশ ব্যস্ত। উইনস্টন যেখানটায় কাজ করে সেই রেকর্ডস ডিপার্টমেন্টে সবাই মিলে বিভিন্ন কক্ষ থেকে চেয়ারগুলো টেনে টেনে হলরুমে বড় টেলিস্ক্রিনের সামনে সারি বেঁধে বসাচ্ছিলো। ‘দুই মিনিটের ঘৃণা’ কর্মসূচির প্রস্তুতি চলছিলো। উইনস্টন মাঝের সারিতে একটি চেয়ারে কেবল বসবে- ঠিক এমনই সময়ে সে কক্ষে দুই জন মানুষের অপ্রত্যাশিত আগমন। এদের উইনস্টন চেনে, আগে দেখেছে, কিন্তু কখনও কথা হয়নি। দুই জনের মধ্যে একজন একটি মেয়ে, যাকে বারান্দায় বিভিন্ন সময় দেখেছে। সে মেয়েটির নাম জানতো না। তবে এটা জানতো, ফিকশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। মাঝে মধ্যে তার তেলমাখা হাতে নাট-বল্টু লাগানোর যন্ত্র দেখে ধারণা করেছে মেয়েটি কোনো একটি উপন্যাস লেখার মেশিনের কারিগর হতে পারে। মেয়েটির চেহারায় কাঠিন্য স্পষ্ট, বয়স সাতাশ হবে, মোটা ঘন চুল, মেচতা পড়া গাল আর চালচলনে খেলোয়াড়সুলভ ভঙ্গি। ওভারঅলের উপর দিয়ে কোমড়ের কাছে জুনিয়র অ্যান্টি-সেক্স লিগের প্রতীক চিকন লাল পরিকর বারকয়েক পেঁচিয়ে বাধা। একটু শক্ত করেই বেঁধে নেওয়া ফলে ওভারঅলের উপর দিয়েও নিতম্বদেশ বেশ সুডৌল হয়ে ফুটে উঠেছে। ঠিক যে মূহূর্তে উইনস্টন মেয়েটিকে দেখলো তখন থেকেই সে তাকে ঠিক নিতে পারছিলো না। কারণটা অজানা নয়। মেয়েটির আগমনের ভঙ্গিমাটি এমন যেনো এটি কোনো হকি খেলার মাঠ, নয়তো ঠাণ্ডা স্নান ঘর, নয়তো কমিউনিটিকে চাঙ্গা করে তোলার কোনো কর্মসূচি, আর সে যেনো এক সুন্দর মননশীলতার ধ্বজাধারী। বস্তুত প্রায় সকল নারীকেই অপছন্দ উইনস্টনের। বিশেষ করে যারা একটু সুন্দরী তাদেরতো বটেই। তার মতে,

সবসময়ই নারীরা, বিশেষ করে যুবতীরা পার্টির সবচেয়ে সংকীর্ণমনা সমর্থক, এরা স্লোগান সর্বস্ব, সুখের মাছি আর অকারণে অযাচিতভাবে যে কোনো ইস্যুতে নাক গলায়। আর এই মেয়েটিকে তার কাছে এদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক মনে হয়। করিডোরে যেদিন প্রথম অতিক্রমণ ঘটে একে অপরের, সেদিন মেয়েটি তার দিকে আড়চোখে তীব্র দৃষ্টি হানে। উইনস্টনের মনে হয়, চাহুনি দিয়েই মেয়েটি তার ভেতরটা দেখে নিয়েছে, আর এতে অন্তর্গত একটা কালো আতঙ্ক বয়ে যায় তার শরীরময়। ভাবনায় এও এলো যে, মেয়েটি ‘থট পুলিশের’ কারিন্দা হতে পারে। এমনটা সত্য হওয়া খুব অসম্ভব। তারপরেও তার ভেতরে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি কাজ করতে থাকে। আতঙ্কের সাথে এক ধরনের শত্রুতার মনোভাব মিশ্রিত হয়। এরপর থেকে যখনই মেয়েটি তার কাছাকাছি আসে তখনই তার ভেতরে একই মনোভাব কাজ করতে থাকে।

অন্য লোকটির নাম ও’ব্রায়েন। ইনার পার্টির একজন সদস্য এবং কিছু পদেও আছেন। তবে সেসব পদের গুরুত্ব এমনই যে উইনস্টন সে সম্পর্কে সামান্যই ধারণা রাখে। পার্টির একজন সদস্য কালো ওভারঅল পরে এসেছে এমন দৃশ্যে মূহূর্তেই চারিদিকে একটা ফিসফিসানির শব্দ বয়ে যায়। ও’ব্রায়েনের দশাসই পেটানো শরীর, মোটা গর্দান, কর্কশ, কৌতুকতা আর বর্বরতার মিশেল চাহুনি। ভয়ঙ্কর দেখতে হলেও তার আচরণে এক ধরনের খুশির ভাব লেপ্টে থাকে। নাকের ওপর চশমাটি ঠিক করার সময় সে এমন একটা কিছু করে যা কৌতুহল সৃষ্টি করে, মজাও দেয়। এর কোনো সংজ্ঞা নেই বটে, তবে তারপরেও কিছুটা সভ্য বলেই তাকে মনে হয়। ভাবভঙ্গিমায়, কেউ তাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর আদর্শবানব্যক্তিদের কারো সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেও, দেখতে পারে।

অনেক বছর ধরে অন্তত ডজন খানেকবার ও’ব্রায়েনকে দেখেছে উইনস্টন। লোকটি তার ভাবনায় ভালো করেই স্থান করে নিতো। তার বিশালাকায় লড়াকু বপু আর ভদ্রোচিত আচরণের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য তাতে তাকে নিয়ে এক ধরণের সিদ্ধান্তহীনতা কাজ করে উইনস্টনের মনে। তবে সেটাই যে একমাত্র কারণ তা নয়। তার চেয়েও বড় কারণ হচ্ছে- তার মধ্যে এক ধরনের বিশ্বাস- অথবা সম্ভবত বিশ্বাস নয় এক ধরনের ভাবনা কাজ কাজ করে যে ও’ব্রায়েন যে রাজনৈতিক মতাদর্শে রয়েছেন তা সঠিক নয়। ওর চেহারায় কিছু একটা আকর্ষণ আছে। এও হতে পারে তার চেহারায় যে ভদ্রোচিত ভাবটি লেখা আছে তার জন্য নয়, ওই আকর্ষণ স্রেফ তার বুদ্ধিমত্তার জন্যই। তবে যাই হোক না কেনো সে এমন একটা লোক যাকে একা পাওয়া গেলে এবং টেলিস্ক্রিনকে ফাঁকি দেওয়া গেলে তার সঙ্গে কিছু বাতচিৎ হতেই পারে। উইনস্টন অবশ্য এই অনুমানকে যাচাই করে দেখার সামান্য চেষ্টাও করেনি। যদিও সে চেষ্টা করার সুযোগও খুব ছিলো তা নয়। ঠিক এই মূহূর্তে ও’ব্রায়েন তার হাতঘড়িটির দিকে তাকিয়ে। দেখে নিলেন তখন প্রায় এগারোটা বাজে। হাবভাবে বোঝা গেলো

দুই মিনিটের ঘৃণা কর্মসূচি শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি রেকর্ডস ডিপার্টমেন্টেই থাকছেন।

উইনস্টন যে সারিতে বসে ঠিক সেই সারিতেই কয়েকটি চেয়ার দূরে বসলেন ও’ব্রায়েন। ধূসরকেশী যে মেয়েটি উইনস্টনের পাশের কক্ষ থেকে চেয়ার টেনে সাজাচ্ছিলো সে বসেছে তাদের দু’জনের মাঝখানের একটি চেয়ায়ে আর আর সেই কালোকেশী বসেছে ঠিক তার পেছনে। পরক্ষণেই দৈত্যাকায় মেশিন থেকে হলের শেষ মাথায় বসানো বিশাল টেলিস্ক্রিনের মধ্য দিয়ে একটি কর্কশ ভাঙা কণ্ঠ বাজতে শুরু করলো। একে স্রেফ চ্যাঁচামেচি ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। এতে মেজাজ খিঁচড়ে আপনার দাঁতকপাটি লেগে যাবে আর তা ঘাড়ের কাছের চুলগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠবে। তবে ঘৃণা কর্মসূচির শুরুটা এরকমই হলো।

অবধারিতভাবেই জনগণের শত্রু ইমানুয়েল গোল্ডস্টেইনের মুখ স্ক্রিনে ভেসে উঠলো। দর্শকদের মধ্যে এখানে সেখানে তখন কেবলই কানাঘুষার শব্দ। ধূসর চুলের মেয়েটি ভয় আর বিরক্তি মিশ্রণে একটি অদ্ভুত অভিব্যক্তি দিলো। পার্টির বিদ্রোহী আর পশ্চাদপসরণকারী হিসেবে পরিচিত এই গোল্ডস্টেইন। আগে দলের প্রধানসারির নেতাই তিনি ছিলেন, অনেকটা বিগ ব্রাদারের সমমাপের, সম পর্যায়ের। পরে প্রতিবিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন, তার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানাও জারি হয়। কিন্তু রহস্যজনকভাবে কিভাবেই যেনো বেঁচে যান, আর নিরুদ্দেশ হয়ে যান। দুই মিনিটের ঘৃণা কর্মসূচি একেক দিন একেকরকম। কিন্তু এমন একটিদিনও পাওয়া যাবে না যেদিন এর প্রধান লক্ষ্যবস্তু গোল্ডস্টেইন নন। তিনি ছিলেন প্রথম ও প্রধান বিদ্রোহী। দলের পবিত্রতার প্রথম বিনষ্টকারী। ধরে নেওয়া হয়, পরবর্তীতে পার্টিতে যত অপরাধ, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, নাশকতা, বিচ্যুতি যা কিছুই হয়েছে তার সবকিছুই এই গোল্ডস্টেইনের শিক্ষাপ্রসূত। কোথাও কোন অজ্ঞাতস্থানে বসে এখনো তিনি তার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন। হতে পারে সমুদ্রের ওপার থেকে, নয়তো বিদেশি কোনও চক্রের ছত্রছায়ায়, এমনকি হতে পারে, ঠিক যে গুজব প্রায়শঃই কানে আসে, এই ওসেনিয়ার ভেতরেই কোনো একটি গুপ্ত আস্তানা থেকে। উইনস্টনের মধ্যচ্ছদা শুকিয়ে আসছিলো। গোল্ডস্টেইনের চেহারাটা যখনই সে দেখে একটা ব্যাথাভরা অনুভূতি বয়ে যায়। কৃশকায় ইহুদি মুখ, মাথায় ঘন সাদা চুল, ছোট ছাগলা দাড়িতে চতুর চেহারা, একটা সহজাত অবজ্ঞার ভাব মুখে মাখা, লম্বা পাতলা নাকের ডগায় বসানো চশমা জোড়ায় এক ধরনের জরাগ্রস্ত বোকাটে ভাবের প্রকাশ। সব মিলিয়ে ভেড়ার মতো দেখতে আর কণ্ঠস্বরও সেই ভেড়ারই মতোন। দলের নীতির বিরুদ্ধে গোল্ডস্টেইন আক্রমনাত্মক ভঙ্গিতে সমানে বিষোদগার করে যাচ্ছিলেন। প্রতিটি বাক্যে এমন অত্যুক্তি ও ন্যয়ভ্রষ্টতা ছিলো যে, ছোট্ট শিশুটি পর্যন্ত তা পরিষ্কার বুঝতে পারে। আর এমন একটা বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে বলে

যাচ্ছিলেন যে অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিসম্পন্নরা সহজেই তার কথাগুলো মেনেও নিতে পারে। বাক্যবাণে বিগ ব্রাদারকে নাজেহাল করে যাচ্ছিলেন গোল্ডস্টেইন। দলের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় তুললেন আর দাবি তুললেন, ইউরেশিয়ার সঙ্গে যেনো এখনই একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা হয়। তিনি বাক-স্বাধীনতার কথা বললেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বললেন, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতার কথা বললেন। হিংস্রভাবে চিৎকার করতে করতে তিনি বললেন, বিপ্লব প্রতারিত হয়েছে- কণ্ঠস্বরের দ্রুত ওঠানামার মধ্য দিয়ে বলে চলা এই কথাগুলো দলের বাগ্মিদের বক্তব্যের স্বভাবজাত ধরণটিরই অনুকরণ। যাতে ছিলো নিউস্পিকের শব্দের ব্যবহার। দলের সদস্যরা বাস্তব জীবনে যতটা নিউস্পিকের শব্দ ব্যবহার করেন তার চেয়েও বেশি।

গোল্ডস্টেইনের এই মিথ্যা ফালতু বয়ানের বাস্তবতা নিয়ে কেউ সন্দেহ করতে পারে এই ভাবনা থেকেই পুরো বক্তৃতার সময়জুড়ে টেলিস্ক্রিনে তার পেছনে দেখানো হচ্ছিলো ইউরেশীয় সেনাদের কুচকাওয়াজ। ভাবলেশহীন কঠিন মুখোভঙ্গির এশীয় চেহারার ওই সেনাদের সারি যেনো শেষ হচ্ছিলো না। একেকটি সারি একেরবার টেলিস্ক্রিনের সামনে চলে এসে আবার দ্রুত সরে যায়, সেখানে এসে হাজির হয় একই রকম দেখতে আরেকটি সারি, সেটিও সরে যায়, আরেকটি আসে। গোল্ডস্টেইনের ভ্যা ভ্যা চিৎকারের ব্যাকগ্রাউন্ডে ভেসে আসছিলো সৈনিকদের বুটের ভারি শব্দ।

ঘৃণার তখন ত্রিশ সেকেন্ডও পার হয়নি। এরই মধ্যে কক্ষের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অবিরাম তাদের ক্রোধের প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছেন। একটি আত্মতৃপ্ত ভেড়ামুখো চেহারা টেলিস্ক্রিনে, তার পেছনে ইউরেশীয় সেনাদের ভীতিকর শক্তির প্রদর্শন, আসলেই এক অসহনীয় দৃশ্য। এর পাশাপাশি গোল্ডস্টেইনের দৃষ্টিভঙ্গি আর চিন্তা আরও ভয় ও ক্রোধ ধরিয়ে দেয়। ইদানিং ইউরেশিয়া কিংবা ইস্ট এশিয়ার চেয়েও বড় ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছেন এই গোল্ডস্টেইন। সাধারণত এই দুটি শক্তির কোনো একটির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে অপরটির সঙ্গে শান্তির সম্পর্কই বজায় রাখে ওসেনিয়া। কিন্তু অদ্ভুত দিকটি হচ্ছে, যদিও গোল্ডস্টেইন সর্বত্র-সকলের কাছেই ঘৃণিত-অপমানিত, যদিও প্রতিদিন এবং দিনে সহস্রবার, মঞ্চে, টেলিস্ক্রিনে, সংবাদপত্রে, বইয়ে তার তত্ত্বের বিরোধীতা হয়, গুঁড়িয়ে-উড়িয়ে দেওয়া হয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ হয়, নোংরা-ফালতু বলে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়- তা সত্ত্বেও তার প্রভাব কখনো কমতে দেখা যায়নি। তার হাতে অপদস্থ হওয়ার জন্য সবসময়ই নতুন বোকামি থেকেই যায়। এমন একটি দিনও পাওয়া যায়নি যেদিন থট পুলিশের হাতে গোল্ডস্টেইনের জন্য কাজ করছে এমন চর কিংবা অন্তর্ঘাতক ধরা পড়েনি। একটি বিশাল ছায়া সেনাদলের অধিনায়ক সে।

একটি গোপন ষড়যন্ত্রকারী নেটওয়ার্কের প্রধান, যারা রাষ্ট্রকে বানচাল করে দিতে চায়।

নেটওয়ার্কের একটি নামও রয়েছে- ‘দ্য ব্রাদারহুড’। একটি ভয়ংকর বইয়ের কথাও শোনা যায়, যেটি আসলে উৎপথগামিতার এক সংক্ষিপ্ত সোপান। গোল্ডস্টেইনই এর রচয়িতা। আর অত্যন্ত গোপনীয়তায় সে বই সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বইয়ের কোনো নাম নেই। কেউ বইটির কথা বলতে গেলে, বা আদৌ যদি বলে, তাহলে স্রেফ ‘দ্য বুক’ কথাটিই ব্যবহার করে। কিন্তু এগুলো কেবল গুজব থেকেই জানা। দলের সাধারণ কোনো সদস্যও বাধ্য না হলে এই ‘ব্রাদারহুড’ কিংবা ‘দ্য বুক’ শব্দের ব্যবহার করবে না।

ঘৃণার দ্বিতীয় মিনিটে গোটা হলেই ক্রোধ ছড়িয়ে পড়লো। মানুষগুলো তাদের নিজ নিজ আসন থেকে লাফিয়ে উঠছিলো আর যতজোড়ে সম্ভব চিৎকার করে যাচ্ছিলো, যেনো তারা স্ক্রিনের ভ্যা ভ্যা শব্দ ছাপিয়ে নিজেদের শব্দ উচ্চারণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ছোট ধূসর চুলের মেয়েটি ততক্ষণে গোলাপী রং ধরেছে, দেখা গেলো তার মুখ ঠিক ডাঙায় তোলা মাছের মতো একবার খুলছে একবার বন্ধ হচ্ছে। ও’ব্রায়েনের ভারী মুখও তখন জ্বলে উঠেছে। তিনি চেয়ারে সোজা হয়ে বসেছিলেন। উঁচু বুকের ছাতি কেঁপে কেঁপে স্ফীত হয়ে উঠছিলো, যেনো তিনি সজোরে আসা ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করে দাঁড়িয়ে আছেন। উইনস্টনের পেছনের কালোকেশী মেয়েটি ততক্ষণে ‘জঘণ্য! শুয়োর!’ গলা ফাটিয়ে এসব বলে চলেছে। আচমকা একটি ভারি নিউস্পিক অভিধান তুলে নিয়ে সেটি স্ক্রিনের দিকে ছুড়ে মারলো সে। সরাসরি ওটি গিয়ে পড়লো গোল্ডস্টেইনের নাক বরাবর। এবং পড়েই ছিটকে এলো। কিন্তু তাতে বক্তব্যে বাধা পড়লো না। এমন একটা মূহূর্তে উইনস্টন নিজেকেও আবিষ্কার করলো যে সেও অন্যদের সঙ্গে সমানতালে চিৎকার করছে আর পায়ের গোড়ালি দিয়ে নিজের চেয়ারের পাদানিতে সজোরে লাথি মারছে।

দুই মিনিটের এই ঘৃণা কর্মসূচির একটা অদ্ভুত দিক হচ্ছে- কেউ এতে উপস্থিত থাকলেও ঘৃণা ছড়াতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ কাজটি না করে পারে না। ভয় আর প্রতিহিংসার উদ্যাম উল্লাস, মেরে ফেলার কিংবা নির্যাতনের প্রগাঢ় ইচ্ছা, হাতুড়ি দিয়ে মুখমণ্ডল থেঁতলে দেওয়ার তীব্র বাসনা সবগুলো মানুষের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো বইতে থাকে। তখন তারা এমনকি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভয়ঙ্কর চিৎকার জুড়ে দেয়। আর প্রত্যেকেই এমন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে যে তাতে নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আর এই আচরণ একজনের কাছ থেকে অন্যজনের মাঝে আগুনের হলকার মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কথা এই যে, উইনস্টনের যে ঘৃনার প্রকাশ দেখা গেলো তা কিন্তু আদৌ গোল্ডস্টেইনের বিরুদ্ধে ছিলো না। বরং সে ঘৃণা ছিলো বিগ ব্রাদারের বিরুদ্ধে, দলের বিরুদ্ধে এবং থট পুলিশের বিরুদ্ধে। আর ঠিক এই মূহূর্তে তার হৃদয় একাকীত্বে ভরে গেলো, উদাসভাবে স্ক্রিনের দিকে তাকালো, আর গোল্ডস্টেইনকে মনে হলো মিথ্যার দুনিয়ায় সত্য আর বিচারবুদ্ধির একক অভিভাবক। আর চারিদিকে এত মানুষের মধ্যে সে নিজেই হচ্ছে এর দ্বিতীয় উদাহরণ। গোল্ডস্টেইন যা কিছু বলছেন তার সবটাই যেনো তার কাছে সত্যি মনে হতে লাগলো। তবে পর মূহূর্তেই আবার বিগ ব্রাদারের প্রতি তার গোপন ঘৃনা রূপ নিলো ভালোবাসায়। বিগ ব্রাদারকে তার অকুতোভয় রক্ষক, এশীয়দের বিরুদ্ধে পাথরকঠিন দৃঢ়তায় দাঁড়িয়ে থাকা একজন অভিভাবক মনে হচ্ছিলো। পক্ষান্তরে গোল্ডস্টেইনকে, তার নির্বাসন, অসহায়ত্ব এবং এমনকি তার সংশয়পূর্ণ অস্তিত্বের পরেও অশুভ জাদুকর বলেই মনে ঠেকলো। মনে হলো- সে যেনো তার কণ্ঠের শক্তি দিয়েই এই সভ্যতার কাঠামোকে ভেঙ্গে দিতে চায়।

এটাও সম্ভব, মূহূর্তের মধ্যেই একজনের ওপর যে ঘৃনা; তা অন্য জনের ওপর চেপে বসে। হঠাৎ, যেভাবে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মাঝেও কেউ তার প্রচণ্ড চেষ্টায় মাথাটিকে বালিশ থেকে সরিয়ে ফেলতে পারে, ঠিক সেভাবেই উইনস্টন তার মনের সব ঘৃনা স্ক্রিনের মুখটি থেকে তার পেছনের কালোকেশী মেয়েটির ওপর ফেলতে সক্ষম হলো। একটি অদ্ভুত ভাবনা তার মনের ভেতর খেলে গেলো। তার মনে হলে একটি রাবারের মোটা লাঠি দিয়ে মেয়েটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে যদি পারে; তাকে উলঙ্গ করে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে সাধু সেবাস্টিয়ানের মতো তীরে তীরে জর্জরিত করতে যদি পারে. কিংবা ওকে প্রথমে বিমোহিত করে পরে ঠিক চরম উত্তেজনার মূহূর্তে যদি জিভটা কেটে নিতে পারে। আর অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন উইনস্টন ভালো করেই যেনো বুঝতে পারছে ঠিক কী কারণে সে মেয়েটিকে ঘৃণা করতো। সে তাকে ঘৃণা করতো কারণ সে যুবতী, সুন্দরী আর ক্লিব, কারণ সে তাকে বিছানায় নিতে চাইতো কিন্তু কখনো পারেনি, কারণ তার মিষ্টি কোমল কটিদেশ, যা বাহুদিয়ে জড়িয়ে রাখার মতো, সেখানে শোভা পাইছে ঘৃণিত ওই লাল পরিকর, যা তার কৌমার্যের উদ্ধত ঘোষণা।

রুম জুড়ে ঘৃণা ততক্ষণে চরমে রূপ নিয়েছে। গোল্ডস্টেইনের কণ্ঠকে তখন সত্যিকারেই ভেড়ার ভ্যা ভ্যা ছাড়া কিছু মনে হচ্ছিলো না।

রুম জুড়ে ঘৃণা ততক্ষণে চরমে রূপ নিয়েছে। গোল্ডস্টেইনের কণ্ঠকে তখন সত্যিকারেই ভেড়ার ভ্যা ভ্যা ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছিলো না। আর স্ক্রিনে তার মুখটি হঠাৎ ভেড়ার মুখ হয়েই ভেসে উঠলো। পরমূহূর্তেই সেই মুখ পাল্টে গেলো এক ইউরেশীয় সৈনিকের মুখাবয়বে। বিশালাকায় ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে সে অবয়ব সামনে এগিয়ে

আসছে, আর তার হাতের সাব-মেশিনগান ভীষণ গর্জাচ্ছে। মনে হচ্ছিলো যেনো স্ক্রিন থেকেই লাফিয়ে বের হয়ে হামলে পড়বে সেই সৈনিক। দৃশ্যের চিত্রায়ন এতটাই ভয়াবহ ছিলো যে, সামনের সারির দিকে বসা কয়েকজন তাদের মাথা কিছুটা পেছনে হেলিয়েও দিলো। তবে মাথাগুলো ফের নিজের জায়গায় যেতে না যেতে ঠিক সেই মূহূর্তে সকলের মুখে স্বস্তির এক গভীর রেখা এঁকে দিয়ে ভয়াবহ সৈনিক মূর্তিটি উবে গেলো, আর ভেসে উঠলো বিগ ব্রাদারের মুখাবয়ব। কালো চুল, কালো গোঁফ, ক্ষমতার আধার, রহস্যময় এক শান্তির প্রতীক। আর সে ছবি এতটাই বড় যে গোটা স্ক্রিন জুড়ে ছিলো তার উপস্থিতি।

তবে বিগ ব্রাদার যা বলছিলেন তা কারো কানে ঢুকছিলো না। কি আর হবে! উৎসাহব্যাঞ্জক কিছু বক্তব্য। যুদ্ধের ডামাডোলে এধরনের কথাবার্তা খুব শোনা যায়, নেই স্পষ্ট কোনো বার্তা, কিন্তু বলার ধরনে এক ধরনের আস্থার অভিব্যক্তি আছে। এরপর একসময় বিগ ব্রাদারের মুখমণ্ডলটিও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো। আর স্ক্রিন জুড়ে ভেসে উঠলো তিনটি স্লোগান-

যুদ্ধই শান্তি স্বাধীনতা দাসত্ব অজ্ঞতাই শক্তি

তবে বিগ ব্রাদারের মুখটি এরপরেও কয়েক সেকেন্ড ধরে পর্দায় ভাসছে বলেই মনে হচ্ছিলো, কারণ প্রত্যেকের চোখের মনিতে এর যে প্রভাব তা এত দ্রুত মুছে যাবার নয়। ছোট ধূসরকেশী তার সামনের চেয়ারের ওপর ঝুঁকে পড়লো বির বির করে কি যেনো বলতে বলতে। শব্দটি উইনস্টনের কানে এলোও বটে- ‘আমার ত্রাতা!’। আর এ কথা বলে মেয়েটি তার দুবাহু ছুঁড়ে মারলো স্ক্রিনের দিকে। পরক্ষণেই দুই হাতের তালু দিয়ে চোখমুখ ঢেকে নিলো। দেখে মনে হলো- নিশ্চয়ই এখন কোনো প্রার্থনায় রত হয়েছে সে।

এমনই একটা মূহূর্তে গোটা কক্ষে একধরনের গুঞ্জন শুরু হলো। চারিদিক থেকে ছন্দময় ধ্বনি আসতে লাগলো ‘বি-বি!….বি-বি!’ বার বার উচ্চারিত হতে লাগলো সে ধ্বনি। ধীরে ধীরে প্রথম ‘বি’ উচ্চারণের পর একটু থেমে দ্বিতীয় ‘বি’ উচ্চারণ। একটি ভারী গুঞ্জন। কিন্তু আপনি একটু কৌতুহলী হয়ে কান পেতে শুনলে বুঝতে পারবেন এ ধ্বনি আসলে অনেকগুলো খালি পায়ের দুমদুম শব্দ বৈ কিছু নয়। সম্ভবত টানা ত্রিশ সেকেন্ড চললো ওই ‘বি-বি!’। আপনি যখন কোনও আবেগ দ্বারা তাড়িত থাকবেন তখন এমন শব্দ আপনার কানে পৌঁছাবেই না। অংশত এটি বিগ ব্রাদারের প্রাজ্ঞতা আর রাজসিকতার স্তুতি গান, তবে তার চেয়েও বড় কথা এটি আসলে আত্মসংবেশন, ছন্দময় শোরগোলের মধ্যে থেকে সচেতনতার সলিল সমাধি। উইনস্টনের ভেতরটা যেনো আরও শীতল হয়ে আসছিলো। দুই মিনিটের

ঘৃণা কর্মসূচি তার বিভ্রমগুলো কাটাতে পারেনি। তবে অমানবীয় ওই ‘বি-বি!…বি-বি!’ ধ্বনি তার ভেতরটা ভীতিতে ভরে দিলো।

এটা নয় যে সে নিজে অন্যদের সঙ্গে এই গুঞ্জনে অংশ নেয়নি; সেটা না নেওয়া সম্ভবও ছিলো না। আপনার অনভূতিকে গোপণ করা, চেহারায় অভিব্যক্তিতে নিয়ন্ত্রণ, অন্যরা যা করছে তা নিজেও করা এসবই এক সহজাত প্রতিক্রিয়া। তবে এরই মধ্যে কয়েকটি সেকেন্ড পাওয়া গিয়েছিলো যখন তার চোখের অভিব্যক্তি কল্পনায় তাকে প্রতারণা করে যায়। এবং ঠিক সেই মূহূর্তেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে- হলফ করে বলতে পারে- নিশ্চিতভাবেই সেটা ঘটেছে।

এক মূহূর্তের জন্য ও’ব্রায়েনের চোখ ধরা পরে উইনস্টনের চোখে। ও’ব্রায়েন তখন উঠে দাঁড়িয়ে। চশমা জোড়া খুলে ফের তা স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় নাকের ডগায় বসাচ্ছিলেন। আর তখনই, ঠিক এক লহমার জন্য তাদের চোখাচোখি হয়। আর সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়টুকুতেই উইনস্টন বুঝে ফেলে- হ্যাঁ সে ঠিক বুঝে নেয়- ও‘ব্রায়েনও তাই ভাবছেন যা রয়েছে তার নিজেরও ভাবনা জুড়ে। এক অভ্রান্ত বার্তা দেওয়া-নেওয়া হয়ে যায়। যেনো তাদের দুজনেরও দুটি মন খুলে গেছে, এবং তাদের একজনের ভাবনা চোখের চাহুনির গতিপথে অন্যজনের ভেতর ঢুকে গেছে। ও’ব্রায়েন যেনো তাকে বলে দিলেন, ‘আমি তোমার সাথে আছি। আমি স্পষ্ট করেই জানি কি রয়েছে তোমার ভাবনা জুড়ে। আমি তোমার অপছন্দের কথা জানি, তোমার ঘৃণার কথা জানি, তোমার ক্ষোভের কথা জানি। কিন্তু ভয় পেয়ো না, আমিও তোমার দিকেই আছি!’ এর পরপরই বুদ্ধিমত্তার সেই দীপ্তি নিমেষে মিইয়ে গেলো। আর ও’ব্রায়েনের চেহারা ঠিক অন্যদের চেহারার মতোই হেঁয়ালিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

ব্যস এটুকুই। আর এরপর উইনস্টনের ভেতর আবারও অনিশ্চয়তা ভর করলো, আসলেই কি ঘটনাটি এমন ঘটেছে! এ ধরনের ঘটনা কখনোই কোনো পরিণতি পায় না। যা হয়, তা হচ্ছে- ভেতরে একটা বিশ্বাস অথবা প্রত্যাশা জাগ্রত হয় এই ভেবে যে, সে ছাড়া অন্যরা দলের শত্রু। ব্যাপক গোপণ ষড়যন্ত্রের যে গুজব, তা সত্যি হতেও পারে, হতে পারে ব্রাদারহুডেরও অস্তিত্ব রয়েছে! এত গ্রেপ্তার, এত স্বীকারোক্তি, এত মৃত্যুদণ্ডের পর ব্রাদারহুড যে কেবলই একটি জনশ্রুতি নয়, তা নিশ্চিত হওয়া কঠিন। কোনো কোনো দিন এতে তার বিশ্বাস হয়, কোনো দিন হয় না। কোনো প্রমাণ ছিলো না, কেবলই একটি পলায়নপর চোখের চাহুনি, যার কিছু অর্থ থাকতেও পারে; নাও থাকতে পারে। শুনে ফেলা কোনো কথপোকথন, টয়লেটের দেয়ালে লেখা শব্দের অষ্পষ্ট আঁকিবুকি- একদা, এমনকি, যখন দুই আগন্তুকের দেখা হয়, তখনও হাতের ছোট্ট নড়াচড়াই এক ধরনের স্বীকৃতির ইঙ্গিত বহন করে। এসব কিছুই অনুমান। সবই তার কল্পনা। ও’ব্রায়েনের দিকে আর একটি বারের মতোও না তাকিয়ে সে

নিজের কক্ষে চলে গেলো। সেই এক লহমার দৃষ্টি বিনিময়ের কোনো ফলোআপ হতে পারে এমনটি তার মনেও আসেনি। মনে যদি সে কথা আসতো তাহলে তা হতো অকল্পনীয় বিপদের কারণ। এক দণ্ড, দু-দণ্ডের জন্য তারা তাদের অস্পষ্ট দৃষ্টি বিনিময় করেছে, আর সে গল্পের সেখানেই সমাপ্তি। যদিও সেটি ছিলো স্মরণযোগ্য ঘটনা, তবে তা স্রেফ রূদ্ধঘরের একাকীত্বেই স্মরণ করা যেতে পারে, আর তার মধ্য দিয়েই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়।

উইনস্টন মাথা তুললো আর আরও সোজা হয়ে বসলো। পেটের ভিতর থেকে উঠে আসা একটি ঢেঁকুর বের করে দিলো। পাকস্থলী থেকে জিন ততক্ষণে পাক দিয়ে উপরে ঠেলে উঠতে চাইছে।

আবারও চোখ ফেললো কাগজের দিকে। সে দেখলো অসহায় চিন্তুাগ্রস্ততা নিয়ে সে যখন বসেছিলো তখনও সে আসলে লিখেই চলছিলো, যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে সে কাজ। আর এই লেখা ঠিক আগের মতো ঘিঞ্জি, অসুন্দর হাতের লেখা নয়। তার কলম মনের সুখে মসৃণ পাতায় লিখে গেছে, বড় বড় অক্ষরে সে লেখা- বিগ ব্রাদার নিপাত যাক বিগ ব্রাদার নিপাত যাক বিগ ব্রাদার নিপাত যাক বিগ ব্রাদার নিপাত যাক বিগ ব্রাদার নিপাত যাক…

এভাবেই বার বার, পুরো আধা পৃষ্ঠা জুড়ে একই লেখা।

আতঙ্কের বেদনায় মুষড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ রইলোনা উইনস্টনের। যদিও তা ছিলো অযৌক্তিক। কারণ ডায়রি লেখা শুরু করার যে বিপদ, এই কথাগুলো তার চেয়ে বড় বিপদের কারণ হবে; এমনটা নিশ্চয়ই নয়। তবে তারপরেও এক মূহূর্তের জন্য তার মনে হলো পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে আর পুরো উদ্যোগটিই বাতিল করে দেয়।

কিন্তু সে তা করলো না, কারণ সে জানতো, অযথাই করা হবে সে কাজ। বিগ ব্রাদার নিপাত যাক লেখা কিংবা এই লেখা থেকে বিরত থাকা এসবের কোনো কিছুই কোনও ভিন্নতা বয়ে আনবে না। ধরা পড়লে থট পুলিশ তার সঙ্গে দুটো কাজের জন্য একই ব্যবহার করবে। আর যদি একটি বারের জন্যও সে কাগজে কলম না ছোঁয়ায়, তাতেও কিছু যায় আসে না। কারণ অপরাধ যা করার সে করে ফেলেছে। একটি বড় অপরাধের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে আর সব অপরাধ। ওরা একে বলে চিন্তাঅপরাধ (থটক্রাইম)। থটক্রাইম চিরদিন ঢেকে রাখা যায় না। আপনি হয়তো সফলভাবে সে অপরাধ কিছু সময়ের জন্য, এমনকি কিছু বছরের জন্য ঢেকে রাখতে পারবেন, কিন্তু আজ নয়তো কাল, এখনই নয়তো আরও পরে তা বেরিয়ে আসবেই।

কাজটি রাতেই ঘটে। গ্রেপ্তার করার জন্য রাতকেই ওরা বেছে নেয়। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ একটি ঝাঁকুনি, একটি কর্কশ হাত আপনার কাঁধে, আপনার চোখের ওপর আলো জ্বলছে, বিছানার চারিদিকে ঘিরে রয়েছে কঠিন মুখগুলো। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো বিচার-আচারের বালাই নেই, গ্রেপ্তারের কোনো খবরও নেই। মানুষগুলো ঠিক গুম হয়ে যায়, আর সব সময়ই তা রাতের বেলায়। এরপর আপনার নামটি নিবন্ধনের খাতা থেকে কেটে দেওয়া হবে। আপনি কোথায় কখন কি করেছেন তা সব মুছে ফেলা হবে। আপনি যে কখনো কেউ ছিলেন তাই অস্বীকার করা হবে, এবং এরপর ধীরে ধীরে সবাই সব ভুলে যাবে। আপনি বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। সাধারনত যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে- ‘উবে যাওয়া’।

এক মূহূর্তের জন্য স্নায়ুবৈকল্যে পেয়ে বসলো উইনস্টনকে। সে আবার লেখা শুরু করলো এলোমেলো এবং আরও দ্রুততায়-

ওরা আমাকে গুলি করবে, আমি পরোয়া করি না। ওরা আমার ঘাড়ের পেছনে গুলি করবে, আমি পরোয়া করি না। বিগ ব্রাদার নিপাত যাক। ওরা সবসময়ই যে কাউকে ঘাড়ের পেছনে গুলি করে। কিন্তু তাতে আমি পরোয়া করিনা। বিগ ব্রাদার নিপাত যাক।

ফের চেয়ারে হেলান দিলো, আর কিছুটা লজ্জাবোধ করে আবার কলম নিয়ে ডায়রির ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। এবার শুরু হলো আরও তীব্রতায়। ঘরের দরজায় ঠিক তখনই কড়া নাড়ার শব্দ।

এরই মধ্যে! ইঁদুরের মতো চুপ হয়ে বসে থাকলো সে এক অকারণ প্রত্যাশায়, যাই হোক সাড়া না পেয়ে একবার চেষ্টা করে চলে যেতে পারে। কিন্তু না, কড়া নাড়ার শব্দ বেড়েই চলছে। দেরি করার ফল হবে সবচেয়ে খারাপ। তার হৃদযন্ত্র ততক্ষণে দ্রিম দ্রিম দামামা বাজিয়ে চলেছে, কিন্তু চেহারাটি দীর্ঘ অভ্যাসের কারণে সম্ভবত তখনও ভাবলেশহীন। উঠে দাঁড়ালো, আর দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দরজার নবে হাত দিয়েই উইনস্টনের চোখে পড়লো টেবিলের ওপর ডায়রিটা খোলা। পাতাজুড়ে লেখা আছে, ‘বিগ ব্রাদার নিপাত যাক’। সে লেখা এত বড় বড় অক্ষরে যে রুমের যে কোনো জায়গা থেকে পড়া যাবে। স্রেফ বোকামি বৈ কিছু নয়। তবে এত আতঙ্কের মাঝেও উইনস্টনের মাথায় এলো- এত সাধের নোটবুকটির ক্রিমের মতো মসৃণ পাতায় সদ্য লেখা ভেজা কালি ছেতড়ে যেতে পারে। সেটা উচিত হবে না। অতএব খোলাই থাক।

বড় একটা দম নিয়ে দরজা খুললো। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির উষ্ণতা বয়ে গেলো শরীর জুড়ে। ফ্যাকাশে মুখে বিধ্বস্ত এক নারী উশকো- খুশকো চুলে তার দরজায় দাঁড়িয়ে।

‘ও কমরেড,’ বলার ভঙ্গিতে বিগলিত ভাব ছড়িয়ে দিলেন, রিনরিনে কণ্ঠ, ‘তুমি এসেছো টের পেলাম, একটু কি আসবে নাকি। আমার রান্নাঘরের সিঙ্কটা না বন্ধ হয়ে গেছে-’

ইনি মিসেস পারসন্স। একই তলার প্রতিবেশীর স্ত্রী। (পার্টিতে মিসেস বলার চল নেই। বরং বারণ আছে। আপনাকে বলতে হবে ‘কমরেড’। কিন্তু কতিপয় নারীকে দেখলে ওই শব্দটি ঠিক আসে না।) এই নারীর বয়স বছর ত্রিশেক, কিন্তু দেখতে আরও বয়সী মনে হয়। তাকালে মনে হবে তার মুখমণ্ডলের ভাঁজে ভাঁজে ধুলোর আস্তর জমে আছে। উইনস্টন কথা না বাড়িয়ে ওর পিছু নিলো।

এই ফালতু সারাইয়ের কাজটি এখন মোটামুটি তার নিত্য বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিক্টরি ম্যানশন্সের ফ্ল্যাটগুলো বেশ পুরোনো। ১৯৩০ কিংবা ওই সময়েরই তৈরি। আর এখন এর ছাদ-দেয়ালের পলেস্তারাগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে। একটু বেশি বরফ পড়লে পাইপ ফাটবেই। অর্থনীতির নীতির চাপে হিটিং সিস্টেম এখন বন্ধ। তবে যখন বন্ধ ছিলো না তখনও খুব যে ভালো কাজ করতো এমন নয়। সারাইয়ের কাজ নিজে নিজে করে নিতে পারলে ভালো তা না হলে কিছুই করার নেই। জানালার শার্সি ভাঙলেও তা সারাইয়ের দায়িত্ব যাদের তারা আসবে না। বছর দুই হয়ে গেলো এসবে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে।

‘টম বাড়িতে নেই তাই ডাকছি,’ অষ্ফুট স্বর মিসেস পারসন্সের।

পারসন্সদের ফ্ল্যাটটি উইনস্টনের ফ্লাটের চেয়ে বড় আর একটু বেশিই নোংরা। সবকিছু যেনো ছিঁড়ে-খুঁড়ে ছড়িয়ে রয়েছে; যেনো কোনও অতিকায় হিংস্র জন্তু এইমাত্র গোটা ঘরটি দাবড়ে তছনছ করে গেছে। খেলার মালমাত্তা চারিদিকে- হকি-স্টিকস, বক্সিং গ্লাভস, ফেঁটে চুপসে যাওয়া ফুটবল, ঘামে জবজবে একটি শর্টস মেঝেতে উল্টো হয়ে পড়ে আছে। টেবিলে পড়ে আছে এঁটো থালা-বাসন আর একটা শরীরচর্চার বই। দেয়ালে ইয়ুথ লিগ ও স্পাইসের জ্বলজ্বলে ব্যানার আর বিগ ব্রাদারের প্রমাণ সাইজের একটি পোস্টার ঝুলছে। পুরো ভবন থেকেই সিদ্ধ বাঁধাকপির একটা গন্ধ সারাক্ষণই আসে। তার ওপর এই কক্ষে ছড়িয়ে আছে তীব্র ঘামের গন্ধ। প্রথম নিশ্বাসেই এই গন্ধ আপনার নাসিকা রন্দ্রে ধাক্কা দেবে। বোঝা দায়- একটি লোক যখন উপস্থিত নেই তখনও তার ঘামের তীব্র গন্ধটি কি করে গোটা কক্ষজুড়ে ছড়িয়ে থাকে। অপরকক্ষে কেউ একজন একটি চিরুনি আর একটুকরা টয়লেট পেপার হাতে টেলিস্ক্রিনের সামরিক বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে

চলছে।
‘বাচ্চাদের কাজ,’ দরজায় মুখটি গলিয়ে দিয়ে আধা-উদ্বেগের অভিব্যক্তি ছড়িয়ে বললেন মিসেস পারসন্স। ‘আজ ওরা বাইরে যায়নি। আর বুঝতেই পারছেন…’

মাঝপথে কথা থামিয়ে দেওয়া মিসেস পারসন্সের অভ্যাস। রান্নাঘরের সিঙ্ক কানায় কানায় ভরে আছে সবুজ রঙের ঘিনঘিনে পানিতে, তাতে সিদ্ধ বাঁধাকপির চেয়েও নিকৃষ্ট গন্ধ। উইনস্টন নিচু হয়ে পাইপের সংযোগ পয়েন্টটি দেখে নিলো। হাত দিতে গা গুলিয়ে আসছিলো। নিচু হয়ে দেখতেই ঘৃণাবোধ হচ্ছিলো তার। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণত কাশির ধমক উঠে যায়। মিসেস পারসন্স অবশ্য তখনও অসহায় মুখ করে তাকিয়ে।

‘টম বাড়িতে থাকলে চিন্তাই ছিলো না, ঠিক হাত দিয়ে পরিস্কার করে ফেলতো। এসবে হাত লাগাতে ওর একটুও খারাপ লাগে না।’

সত্য মন্ত্রণালয়ে উইনস্টনের সহকর্মী পারসন্স। মোটাসোটা, কিন্তু খাটুড়ে। হাঁদারাম গোছের, সবকিছুতেই বাড়তি আগ্রহ। কোন প্রশ্ন ছাড়াই যে দায়িত্বই দেয়া হোক কাজে লেগে পড়ে। থটপুলিশ নয়, আসলে এমন কিছু নিয়োজিত কর্মীর কারণেই পার্টি টিকে আছে।

পয়ত্রিশ বছর বয়সে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে ইয়ুথ লিগ থেকে বের হয়ে আসতে হয়। ইয়ুথ লিগের আগে বয়সের বাধা সত্ত্বেও ব্যবস্থা করে বছরখানেক স্পাইসেও কাটিয়েছেন। সত্য মন্ত্রণালয়ে তার কাজ নিচের দিকের একটি পদে। এমনই কাজ যাতে বুদ্ধির প্রয়োগ নেই বললেই চলে। তবে স্পোর্টস কমিটিতে তিনি কিন্তু হোমড়া-চোমড়াদের একজন। এছাড়াও কমিউনিটি চাঙ্গা করার কর্মসূচি, তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ কর্মসূচি, সঞ্চয় ক্যাম্পেইনের মতো স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচি হলেও তাকে কমিটিতে রাখা হয়। তখন বেশ বুক ফুলিয়ে বিষয়টি সবাইকে জানান দিতে থাকেন পারসন্স। পাইপে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাব-ভঙ্গিমা দেখিয়ে ওসব বলবেন। গত চার বছরে কোনও সন্ধ্যায় কমিউনিটি সেন্টারে তাকে একটি বারের জন্য হলেও দেখা যায়নি, এমনটা ঘটেনি। আর জীবন সম্পর্কে তার উদাসীনতার প্রমাণ স্বরূপ ঘামের বিকট গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে তিনি যেখানে যান সেখানেই।

‘সংযোগ পয়েন্টের নাটটি মুছতে মুছতে উইনস্টন বললো, ‘আপনাদের ঘরে স্প্যানার আছে?’

‘স্প্যানার,’ বললেন মিসেস পারসন্স। পরে কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এলো, বললেন, ‘আমি ঠিক জানি না, নিশ্চিত নই। সম্ভবত বাচ্চারা…।’

বুটের ঠক ঠক শব্দ আর চিরুনি ছুঁড়ে মারার শব্দ ভেসে এলো লিভিং রুম থেকে। মিসেস পারসন্স একটি স্প্যানার এগিয়ে দিলেন। উইনস্টন ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে পাইপের সঙ্গে আটকে যাওয়া একদলা চুল ছাড়িয়ে আনলো। এরপর ট্যাপের ঠাণ্ডা পানিতেই ভালো করে আঙ্গুলগুলো সাফ করে পাশের রুমে গিয়ে দাঁড়ালো। ‘হাত তোলো’ ঝাঁঝালো একটি কণ্ঠ চিৎকার করে উঠলো।

হ্যান্ডসাম, কঠিন চেহারার নয় বছরের একটি ছেলে টেবিলের পেছন থেকে মাথা তুললো। একটি স্বয়ংক্রিয় খেলনা পিস্তল হাতে হুঙ্কার ছুড়তে ছুড়তে। অন্যদিকে তার ছোট বোনটি, বছর দুয়েকের ছোট হবে, একটি কাঠের টুকরো হাতে একই ভঙ্গিমায় চিৎকার করে যাচ্ছে। দুজনই নীল শর্টস আর ধূসর রঙের শার্ট পরা, গলায় লাল গলবন্ধ। এটা ছিলো স্পাইসের ইউনিফর্ম। উইনস্টন মাথার উপরে হাত দুটি তুলে দিলো, তবে অনেকটা অস্বস্তির সঙ্গে। ওদের কণ্ঠ ও অঙ্গভঙ্গি তার কাছে মোটেই শিশুসুলভ মনে হচ্ছিলো না। সবমিলিয়ে এটি খেলা বলে ভাবতেও মন সায় দিচ্ছিলো না তার।

‘তুমি ষড়যন্ত্রকারী!’ চিৎকার করে বললো ছেলেটি। ‘তুমি একজন থট ক্রিমিনাল (চিন্তা-অপরাধী)! তুমি ইউরেশীয় চর! আমি তোমাকে গুলি করবো। আমি তোমাকে বাষ্প করে দেবো। আমি তোমাকে লবন দ্বীপে পাঠিয়ে দেবো।’

এরপর হঠাৎই দুজনই ওর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে লাফাতে শুরু করলো আর ‘চক্রান্তকারী!’, ‘চিন্তা-অপরাধী!’ বলে চিৎকার করতে লাগলো। ভাই যেটা বলছে, যা করছে, বোনও একই বুলি আর একই কাজ করে চলছে। বিষয়টি কিছুটা ভীতিরও ছিলো, ঠিক বাঘের ছানার তিড়িংবিড়িংয়ের মতো। শিগগিরই এগুলো বড় হবে আর মানুষখেকো হয়ে উঠবে। বালকটির চোখে এক ধরনের হিংস্রতা মাখা, যাতে মনেই হচ্ছিলো ও মনেপ্রাণে উইনস্টনকে আঘাত করতে কিংবা লাথি মারতে চাইছে। আর তা করার মতো বড়ও সে হয়ে উঠেছে। মন্দের ভালো এই যে, হাতে যে পিস্তলটি সেটি আসল নয়, খেলনা, ভাবলো উইনস্টন।

মিসেস পারসন্সের ভয়ার্ত দৃষ্টি উইনস্টনের দিক থেকে একবার বাচ্চাদের দিকে পড়লো আবার ফিরে এলো। আর লিভিং রুমের অপেক্ষাকৃত বেশি আলোয় এবার উইনস্টন সত্যিই দেখতে পেলো মিসেস পারসন্সের মুখমণ্ডলের ভাজে ভাজে ধুলোর আস্তর।

‘বাচ্চারা সাধারণত এত শোরগোল করে না!’ বললেন তিনি। ‘ফাঁসির কার্যক্রম দেখতে যেতে না পেরে ওরা মন খারাপ করে আছে। আর সে জন্যই এমন আরচণ করছে। এত ব্যস্ততা যে ওদের নিয়েই যেতে পারলাম না। আর টমতো কাজ থেকে সময় মতো ফিরবেই না।’

মোটা কর্কশ কণ্ঠে ছেলেটি চিৎকার করে উঠলো, ‘কেনো আমরা ফাঁসি দেখতে যেতে পারবো না?’

‘ফাঁসি দেখতে চাই! ফাঁসি দেখতে চাই!’ চিৎকার জুড়ে দিলো ছোট মেয়েটিও। তখনও সে ঘুরছে উইনস্টনের চারিদিক।

ইউরেশীয় কয়েকজন কারাবন্দী যুদ্ধাপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। ওই সন্ধ্যায় পার্কে ওদেরই ফাঁসি হওয়ার কথা, মনে পড়লো উইনস্টনের। প্রতি মাসেই একবার এমন ফাঁসির আয়োজন থাকে। আর এখন এই ফাঁসি খুব জনপ্রিয় একটি দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। শিশুরা এই ফাঁসি দেখার জন্য খুব চেচামেচি করে। মিসেস পারসন্সের কাছে বিদায় নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো উইনস্টন। কিন্তু প্যাসেজ ধরে ছয় পা যেতেই কিছু একটা তার ঘাড়ের পেছনের দিকে আঘাত করলো। ভীষণ ব্যাথা অনুভব করলো সে। মনে হলো যেনো একটি লাল হয়ে যাওয়া উপ্তপ্ত শলাকা শরীরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ঘুরে দেখলো মিসেস পারসন্স ছেলেকে টেনে হিঁচড়ে দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আর তখনই ছেলেটি তার পকেটে একটি গুলতি ঢুকিয়ে ফেললো।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দের আগেই তার কানে আসলো বালকটির কণ্ঠ ‘গোল্ডস্টেইন’। তবে উইনস্টনকে যা সবচেয়ে আলোড়িত করলো তা হচ্ছে নারীটির ফ্যাকাশে চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়া ভীতির অভিব্যক্তি।

ফ্ল্যাটে ফিরে একটু ত্রস্ত পায়েই টেলিস্ক্রিনের সামনেটা পার হয়ে আবারও টেবিলের ওপর বসলো সে। ঘাড়ের ব্যাথার ওপরে এক হাত দিয়ে ডলতে লাগলো। টেলিস্ক্রিনের বাজনা বন্ধ হয়েছে। পরিবর্তে একটি ফ্যাসফেসে সামরিক কণ্ঠ নৃশংসতামাখা উচ্চারণে পাঠ করে যাচ্ছিলো নতুন ভাসমান ঘাঁটির অস্ত্র-শস্ত্রের বর্ণনা। আইসল্যান্ড ও ফারো আয়ল্যান্ডের মাঝামাঝি কোনও একটি স্থানে নোঙ্গর করেছে এই ভাসমান ঘাঁটি।

বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এই নারীর সদাসন্ত্রস্ত জীবন, ভাবলো সে। আর মোটে এক কিংবা দুটি বছর। এরা এই নারীর কোনো শাসনই আর মানবে না। আজকাল প্রায় সব শিশুরই একই ভয়ঙ্কর দশা। সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি হচ্ছে, স্পাইসের মতো সংগঠনগুলোর মাধ্যমে এরা প্রক্রিয়াগতভাবেই ছোট ছোট বেপরোয়া নৃংশস চরিত্র হিসেবে গড়ে উঠছে। আবার এমন একটা মনোভাবও তৈরি হচ্ছে যা তাদের দলের বিরুদ্ধে কোনভাবেই বিদ্রোহী করে তুলবে না। দল ও দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেকোনো বিষয়ের প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বস্ততা। দলীয় সঙ্গীত, মিছিল, ব্যানার, প্রচার, ডামি রাইফেল নিয়ে মহড়া, স্লোগান আর বিগ ব্রাদারের স্তুতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তারা। তাদের যত নৃংশতা সব রাষ্ট্রের শত্রুর বিরুদ্ধে, বিদেশিদের বিরুদ্ধে, যড়যন্ত্রকারী, নাশকতাকারী আর

চিন্তা-অপরাধীদের বিরুদ্ধে। আর ত্রিশ বছর পার করে যেকোনো বাবা-মা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে নিজেদের সন্তানদের নিয়েই। কারণটা সঙ্গত। এমন একটি সপ্তাহও যাবে না যখন ‘দ্য টাইমস’ এই আড়িপাতা পাজিগুলোকে, ‘বীর শিশু’ তকমা দিয়ে তাদের কৃতিত্ব গাঁথা প্রকাশ করছে না। এই শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের কথা-বার্তা শুনে ফেলে আর থট পুলিশের কাছে তাদের খাটো করে।

গুলতি দিয়ে ছোড়া বুলেটের ব্যাথা কিছুটা কমেছে। ডায়রিতে লেখার জন্য আর কিই বা আছে- এমন একটি ধন্দের মধ্যে থেকে অনেকটা নিরুৎসাহী ভঙ্গিতে কলমটি তুলে নিলো উইনস্টন। আর হঠাৎ করেই ও’ব্রায়েনকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলো সে।

বছর কয়েক আগে… কত বছর হবে? নিদেন পক্ষে বছর সাতেকতো বটেই…একবার সে স্বপ্ন দেখলো একটি নিকষ-কালো অন্ধকার কক্ষের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। একদিকে কেউ একজন বসে। যখন সে অতিক্রম করে যাচ্ছে ঠিক তখনই লোকটি বলে উঠলো: ‘আমাদের এমন একটি স্থানে দেখা হবে যেখানে কোনো অন্ধকার থাকবে না।’ খুব ধীর আর ভাবলেশহীন ভাবেই কথাটি বললো সে। এ যেনো স্রেফ একটি কথার কথা, কোনো নির্দেশনা নয়। স্বপ্নে লোকটি হেঁটেই চললো, থামলো না। কৌতুহলের বিষয় হচ্ছে সে সময় স্বপ্নের মাঝে কথাগুলো তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া ছড়ায়নি। কিন্তু পরে তার কাছে কথাগুলো ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এখন আর মনে নেই ওই স্বপ্নটি সে ও’ব্রায়েনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে দেখেছিলো, নাকি পরে। তার এও মনে নেই, ঠিক কখন সে ধরতে পেরেছিলো ওই কণ্ঠটি ছিলো ও’ব্রায়েনের। এই ধরতে পারায় কোনো খুঁত নেই। সেই অন্ধকার কক্ষে তাকে কথাটি যিনি বলেছিলেন তিনি ও’ব্রায়েন বৈ আর কেউ নন।

ও’ব্রায়েন তার শত্রু নাকি মিত্র- উইনস্টন কখনোই তা নিশ্চিত হয়ে ভাবতে পারেনা- এমনকি আজ সকালে তাদের চোখাচোখিতে যে লহমামাত্র হলেও একটা ঝলকানি খেলে গেলো, তারপরেও পারেনি। কখনো বিষয়টি নিয়ে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবেও নি সে। তবে এইটুকু বোঝে, তাদের মধ্যে পারষ্পরিক অনুধাবনের একটা যোগসাজশ আছে, যা এই ভালোলাগা বা অংশীদারীত্বের চেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে। ‘আমাদের দেখা হবে যেখানে কোনো অন্ধকার থাকবে না,’ এটাইতো বলেছিলেন তিনি। উইনস্টন জানতো না, কীই এর মানে। তবে খুব মনে হয়, এভাবে নয়তো অন্য কোনোভাবে একদিন কথাটি সত্যি হবে।

টেলিস্ক্রিনের শব্দটা হঠাৎই থেমে গেলো। এরপর ইথারে ভেসে এলো একটি স্পষ্ট কণ্ঠের ঘোষণা- অ্যাটেনশন প্লিজ! আমাদের ম্যালাবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এই মাত্র খবর এলো- দক্ষিণ ভারতে আমাদের সৈন্যরা গৌরবময় বিজয় অর্জন

করেছে। আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে জানাচ্ছি, যে ঘটনার কথা আমরা এখন বললাম তা থেকে বুঝে নেওয়া যায়, যুদ্ধ এখন শেষের দিকে।

তাহলে খারাপ খবর আসছে, ভাবলো উইনস্টন। সে পুরোই নিশ্চিত যে, নিহত আর কারারুদ্ধদের ভয়াবহ সংখ্যাগুলো ঘোষণার পাশাপাশি এক ইউরেশীয় সেনাকে হাপিস করে দেওয়ার যে নৃশংস বর্ণনা চলছে এর পরপরই ঠিক জানিয়ে দেওয়া হবে- আগামী সপ্তাহ থেকে চকোলেটের রেশন ত্রিশ গ্রাম থেকে কমিয়ে বিশ গ্রাম করা হলো।

আরেকবার ঢেঁকুর তুললো উইনস্টন। পাকস্থলী চিমসে করে দিয়ে বাষ্প হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে জিন। টেলিস্ক্রিনে, হতে পারে বিজয়ের উল্লাস প্রকাশে, হতে পারে হারানো চকোলেটের স্মৃতি মুছে দিতে, হঠাৎই ঝনঝনিয়ে বেজে উঠলো ‘ওসেনিয়া টিস ফর দি’ (ওসেনিয়া এ তোমারই জন্যে)। এই গান যখন বাজবে আপনাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই হবে। তবে রক্ষা, যেখানটাতে সে বসে সেখান থেকে তাকে টেলিস্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না।

‘ওসেনিয়া ‘টিস ফর দি’ ধীরে ধীরে হালকা বাজনা স্তিমিত হয়ে আসলো। উইনস্টন টেলিস্ক্রিনে পেছন রেখে জানালার দিকে গেলো। দিনটি যেমন ঠাণ্ডা তেমনি উজ্জ্বল। দূরে কোথাও একটি রকেট বোমা বিষ্ফোরণের ভোঁতা শব্দ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলছে। লন্ডনে আজকাল প্রতি সপ্তাহে ওগুলোর বিশ-ত্রিশটি করে পড়ছে।

নিচে রাস্তায় বাতাসে ছেঁড়া পোস্টারের সেই কোনাটি অবিরাম ঝাপটা খাচ্ছে, আর ইংসক শব্দটি একবার দৃশ্যমান হচ্ছে, আর একবার ঢাকা পড়ছে। ইংসক। ইংসকের পূজনীয় নীতি। নিউস্পিক, ডাবলথিঙ্ক, মিলিয়ে যাওয়া অতীত। তার মনে হলো সমুদ্রের তলদেশে কোনো জঙ্গলে দিক হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো এক দৈত্যের রাজ্যে হারিয়ে গেছে সে, আর সেখানে সে নিজেই এক দৈত্য বনে গেছে। সে একা। স্রেফ একা। অতীত মরে গেছে, ভবিষ্যত কল্পনায় আসছে না। এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে একজন মানব সন্তানকে আর কখনো সে তার পাশে পাবে? আর কিভাবেই বা জানবে- পার্টির এই আধিপত্য চিরদিন ধরে টিকে থাকবে কি না? এসব প্রশ্নেরই একটি উত্তর হয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সত্য মন্ত্রণালয়ের সামনের সেই তিনটি স্লোগান:

যুদ্ধই শান্তি স্বাধীনতা দাসত্ব অবজ্ঞাই শক্তি।

পকেট থেকে পঁচিশ সেন্টের একটি মুদ্রা বের করলো। এতেও একপীঠে খোদাই করা এই স্লোগান; অন্য পীঠে বিগ ব্রাদারের মুখ। ওই মুদ্রার

মধ্যে থেকেও চোখ দুটি পাকিয়ে যেনো তাকেই দেখছে। মুদ্রায়, ডাক টিকিটে, বইয়ের মলাটে, ব্যানারে, পোস্টারে, সিগারেটের প্যাকেটে- সবখানেই। সবসময়ই চোখ দুটো আপনাকে দেখছে এবং একটি কণ্ঠস্বর আপনাকে বন্দি করছে। ঘুমিয়ে কিংবা জেগে, কাজে কিংবা ভোজনে, ঘরে কিংবা বাইরে, গোসলে কিংবা বিছানায়- কোথাও মুক্তি নেই। খুলির ভেতরে গোটা কয় ঘন সেন্টিমিটার জুড়ে আপনার যে মগজ ওইটুকু ছাড়া আপনার নিজের বলে আর কিছুই নেই।

সূর্য ততক্ষণে উল্টো আকাশে পড়েছে। সত্য মন্ত্রণালয়ের অগুনতি জানালার শার্সিতে আলো ঠিকরাচ্ছে না বলে ওগুলোকে বিশাল দুর্গের গায়ে ছোট ছোট ঘুপচির মতো লাগছে। এর অতিকায় পিরামিডীয় আকৃতি ভয় ধরিয়ে দেয়। এতই শক্ত এর গড়ন যে কিছুতেই কিছু হবে না। হাজার হাজার রকেট বোমা ফেললেও না। মনের মধ্যে আবার সেই একই ভাবনা, কার জন্য এই ডায়রি লিখছে সে। ভবিষ্যতের জন্য, অতীতের জন্য- কোনোও একটি কল্পিত সময়ের জন্য! তার সামনে যা অপেক্ষা করছে তা মৃত্যু নয়, স্রেফ ধ্বংস। ডায়েরিটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে, আর তাকে বাষ্পে পরিণত করা হবে। অস্তিত্ব ঘুচিয়ে দেওয়ার আগে, স্মৃতি থেকে সরিয়ে ফেলার আগে সে যা লিখেছে তা কেবল থট পুলিশই পড়বে ও জানবে। তাহলে আপনার কোনও অস্তিত্বই যখন থাকছে না, এমনকি এক টুকরো কাগজে নামহীন-অর্থহীন একটি শব্দও টিকে থাকছে না, তখন ভবিষ্যতের কাছে নালিশেরই বা কী উপায়?

টেলিস্ক্রিন দুপুর ২টার ঘণ্টা বাজালো। দশ মিনিটের মধ্যেই তাকে বের হতে হবে। আড়াইটার মধ্যেই ফিরতে হবে কাজে।

তবে এই ঘণ্টাধ্বনি তার ভেতরে একটি নতুন ভাবনার জন্ম দিলো। সে এক একাকী দৈত্য, সত্য উচ্চারণ করে চলেছে যা কেউ কখনো শুনতেও পাবে না। কিন্তু যখন সে তা উচ্চারণ করছে, হতে পারে অতি মিনমিনে সে উচ্চারণ, তাতে একটা ধারাবাহিকতাতো রক্ষা হলো। কথাগুলো অন্যকে শোনানোর মধ্য দিয়ে নয়, বরং যে মানব ঐতিহ্য সে বহন করে তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার মধ্য দিয়েই এই ধারাবাহিকতা রক্ষা পাবে। টেবিলে ফিরে গেলো উইনস্টন, কালিতে কলম চুবিয়ে নিয়ে সে লিখলো:

ভবিষ্যত কিংবা অতীতেই যাই, পৌঁছুতে হবে একটি সময়ে যখন চিন্তাগুলো মুক্ত হবে, যখন মানুষগুলো একে অন্যের থেকে আলাদা হবে, কিন্তু তারা আর একা হয়ে যাবে না- উপনীত হতে হবে এমন একটি সময়ে যখন তাতে সত্য বিরাজ করবে, আর যা কিছু ঘটছে কিংবা ঘটে গেছে তাকে মুছে দেওয়া হবে না: সরে যেতে চাই এই উর্দির যুগ থেকে, একাকীত্বের যুগ থেকে, বিগ ব্রাদারের যুগ থেকে, দ্বৈত চিন্তার যুগ থেকে- শুভেচ্ছা!

ধরেই নেওয়া যায় তার মৃত্যু হয়ে গেছে, ভাবলো উইনস্টন। তার মনে হলো, এখুনি সে তার ভাবনাগুলো গুছিয়ে ভাবতে শুরু করেছে, সে একটি সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পেরেছে। যে কোনো কাজের পরিণতি ওই কাজের মধ্যেই নিহিত থাকে। সে লিখলো:

চিন্তাঅপরাধ মৃত্যু ডেকে আনে না: চিন্তাঅপরাধ নিজেই এখন মৃত।

নিজেকে একজন মৃত মানুষ হিসেবে মেনে নিয়ে যতক্ষণ সম্ভব বেঁচে থাকাটাই এখন তার কাছে সবচেয়ে জরুরি বলে মনে হলো। ডান হাতের দুটি আঙ্গুলে কালি লেপ্টে গেছে। এতেও আপনি ধরা পড়ে যেতে পারেন। মন্ত্রণালয়ের কিছু নাক গলানো কর্মী (কোনও নারী, হতে পারে সেই ধূসরকেশী কিংবা ফিকশন ডিপার্টমেন্টের কালোকেশী) আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে- কেনো সে মধ্যাহ্ন বিরতিতে লিখতে গেলো- কেনই সে একটি সেকেলে কলম ব্যবহার করলো, কীই বা সে লিখছিলো- এবং অতঃপর যথাযথ কর্তৃপক্ষে একটি ইঙ্গিতও ঠুকে দিয়ে আসতে পারে। বাথরুমে ঢুকে পড়লো উইনস্টন। খসখসে কালচে বাদামি রঙের সাবান, যা হাতে ঘষলে পিচ্ছিল নয়, বরং শিরিস কাগজের মতো চামড়ায় ঘসা লাগায়, তাই দিয়ে যত্নের সঙ্গে আঙুলগুলো পরিষ্কার করলো। ডায়রিটি ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখলো। এটি লুকিয়ে রাখার ভাবনা বৃথা, বরং ভাবলো ডায়রিটি এমনভাবে রেখে যেতে পারে যাতে যে কেউ দেখে ভাববে এটি এখানে অধরা পড়ে আছে অনেকদিন। পাতাগুলোর শেষ মাথায় আড়াআড়ি একটি চুল থাকতেই পারে। চিমটি দিয়ে কিছুটা সাদাটে ধুলো তুলে এনে মলাটের এক কোনায় এমনভাবে রাখলো, যাতে যে কেউ ভাবতে পারে ডায়রিটি কেউ ধরলে এই ধুলাগুলো গড়িয়ে পড়তো, এভাবে জমে থাকতো না।

তৃতীয় অধ্যায়

মাকে স্বপ্ন দেখছিলো উইনস্টন।

মা যখন চলে গেলেন তখন তার বয়স দশ-এগারো বছর। লম্বা গড়নের নিশ্চল খোদাই মূর্তির মতো নিরব এক নারী ছিলেন মা। ধীর লয়ে চলাফেরা করতেন, মাথায় উজ্জ্বল সাদা চুল। বাবাকে যতটা মনে পড়ে হালকা- পাতলা গড়নের ছিলেন। কালো পোশাকে অভ্যস্ত ছিলেন। (উইনস্টনের মনে পড়ে তার বাবার জুতোর তলি থাকতো খুবই পাতলা) চশমা পরতেন। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে দেখা মুখদুটো আবছা মনে আসে।

স্বপ্নে উইনস্টন দেখছিলো তার মা অনেক গভীরে নীচে একটি জায়গায় বসে আছেন। কোলে তার ছোট বোনটি। বোনটিকে উইনস্টনের আর মনেই পড়ে না। ক্ষুদে দুর্বল একটি শিশু, বড় বড় চোখ করে সদাই নিরব তাকিয়ে থাকতো, এটুকুই মনে আসে। গভীর খাদ থেকে ওরা দুজনই উইনস্টনের দিকে

তাকিয়ে আছে। ওরা যেখানে তার যেনো কোনও তল নেই। নলকূপের গভীর তলদেশ যেমনটা হয়, অথবা গভীর কোনো কবর- এটি এমনই এক স্থান যা ওর থেকে অনেক অনেক নীচে, আর তারা আরও নীচেই নেমে যাচ্ছিলো। ওরা যেনো একটি ডুবন্ত জাহাজের সেলুনের ভেতর, আর ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসা পানির ভেতর থেকে ওরা উপরে তার পানে তাকিয়ে। ওরা তখনও তাকে দেখতে পাচ্ছে আর সেও ওদের দেখছে, কিন্তু ক্রমশঃই ওরা গভীর থেকে আরও গভীরে ডুবে যাচ্ছিলো। ডুবে যাচ্ছিলো সবুজ জলরাশির ভেতর, যেনো তারা একবার চোখের আড়াল হলে চিরতরে হারিয়ে যাবে। সে বাইরে, চারিদিকে আলো-বাতাস, আর ওদের মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর সে উপরে বলেই ওরা নীচে যাচ্ছে। এটা সে জানতো, ওরাও জানতো। আর ওরা যে জানে তা ওদের চেহারায় ফুটে রয়েছে। তবে এ জন্য ওদের চেহারায় কিংবা হৃদয়ের গভীরে কোনো অভিযোগ নেই। ওদের একটা বিষয় জানা, মৃত্যুই তাদের পথ আর তা এই জন্য যে, উইনস্টনকে বেঁচে থাকতে হবে। এটাই যেনো এক অমোঘ বিধান।

কি ঘটেছিলো তা আর মনে নেই, তবে স্বপ্নে সে জানতো, কোনও না কোনও পথে তার জীবনের জন্যই মা ও বোনের জীবন উৎসর্গ হয়েছে। কিছু স্বপ্ন আছে যাতে স্বপ্নের দৃশ্যপটে মনোজাগতিক জীবনের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকে এবং স্বপ্নের মাঝেই কিছু ঘটনা ও ভাবনা এসে যায় যা সম্পর্কে স্বপ্নদ্রষ্টা সতর্ক হয়ে ওঠে, যা আবার স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর জাগ্রত অবস্থায়ও মূল্যবান মনে হতে থাকে। এটিও ছিলো তেমনই এক স্বপ্ন।

এখন উইনস্টনের মনে যা খেলে যাচ্ছে, তা তার মায়ের হারিয়ে যাওয়ার স্মৃতি। বছর ত্রিশেক আগের সে ঘটনা যতটা হৃদয়ভাঙ্গা ছিলো এখন আর তেমনটা ঘটে না। বিয়োগান্তক এই বিষয়গুলো আগেই বেশি আলোড়িত করতো। সে সময় মানুষের কাছে একান্ততা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এগুলোর মূল্য ছিলো। পরিবারের একজনের পাশে অন্যজন দাঁড়াতো, প্রশ্নটিও করতো না। মায়ের হারিয়ে যাওয়ার স্মৃতি তার হৃদয়টাকে ভেঙ্গে দেয় কারণ তাকে ভালোবেসেই ছিলো মায়ের চলে যাওয়া। সে সময় প্রতিদানে ভালোবাসা দেওয়ার মতো বড় সে ছিলো না। আর সে মনেও করতে পারে না কিভাবে আনুগত্যের কাছে ছিলো তার আত্মোৎসর্গ, যা ছিলো একান্তই ব্যক্তিগত আর অবশ্যম্ভাবী।

অতীতে যা কিছু সে দেখেছে, আজকাল আর তা ঘটেই না। ভয়, ঘৃণা ও কষ্ট জর্জরিত একটি সময় এখন। এখানে আবেগের মর্যাদা নেই, কোনও গভীর বা যৌগিক দুঃখবোধও কাজ করে না। অথচ এর সবটাই সে যেনো দেখতে পেলো তার মা ও বোনের দুজোড়া বিষ্ফোরিত চোখে। উর্ধ্বপানে দৃষ্টি মেলে তারা তাকে দেখছিলো, সবুজ পানির ভেতর থেকে, শতশত বাঁও গভীর থেকে তারা দেখছিলো। আর তখনও তারা আরও গভীরেই ডুবে যাচ্ছিলো।

এবার দেখলো, কোনও এক গ্রীস্মের বিকেলে একটি স্প্রিংয়ের টার্ফের ওপর সে দাঁড়িয়ে। সূর্যের তীর্যক আলো ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। এমন একটি দৃশ্যপট এই প্রথম নয়, প্রায়শঃই তার স্বপ্নে আসে, তবে উইনস্টন নিশ্চিত হতে পারে না, বাস্তবে কখনোই এমনটি সে দেখেছে কি না। তার বয়ে চলা চিন্তাধারায় নিজেই এর নাম দেয় সোনালি দেশ। একটি খরগোশের আঁচড়কাটা পুরোনো চারণভূমি, মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে পায়েচলা পথ। আর ছোট ছোট ঢিবি ছড়িয়ে এখানে সেখানে। মাঠের উল্টোদিকের শীর্ণ বেড়া ঘেঁষে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে দেবদারু গাছের পাতাগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে ঝিরিঝিরি নড়ছে। নারীর চুল যেমন বাতাসে ওড়ে দেবদারুর পাতায়ও তেমন নাচন লেগে আছে। যদিও দৃষ্টির বাইরে, তাও বুঝা যাচ্ছে কাছেই কোথাও ধীর স্রোতে বয়ে চলছে স্বচ্ছজলের নদী, যাতে উইলো গাছের ছায়ায় মিঠা পানির মাছেরা সাঁতার কাটছে।

কালোকেশী মেয়েটি মেঠোপথ ধরে এগিয়ে আসছে। এক লহমায় তার মনে হলো মেয়েটি তার গায়ের পরিধান টেনে ছিঁড়ছে আর তাচ্ছিল্যভরে আশেপাশে ছুঁড়ে ফেলছে। তার ফর্সা, নিটোল দেহবল্লরী উইনস্টনের মধ্যে কোনও আগ্রহই তৈরি করছে না, এমনকি সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না সে। বরং শরীর থেকে কাপড় ছুঁড়ে ফেলায় মেয়েটির যে তাচ্ছিল্যের প্রকাশ ছিলো, সেটিই তাকে বেশি আলোড়িত করছে। এই সাবলীল অবজ্ঞা প্রকাশের মধ্য দিয়ে একটি সংস্কৃতি বিধ্বস্ত হলো, ধ্বংস হলো চিন্তার প্রক্রিয়া। একটি অসামান্য বাহুছোঁড়ার ভঙ্গিমায় যেনো বিগ ব্রাদার, পার্টি আর থট পুলিশ অসারতায় ভেসে গেলো। এটিও ছিলো প্রাচীণ সময়েরই একটি ভঙ্গিমা। ‘শেক্সপিয়র’ শব্দটি ঠোঁটে নিয়ে ঘুম ভাঙলো উইনস্টনের।

কান ঝাঁঝানো সিটি বাজিয়ে চলছে টেলিস্ক্রিন। ত্রিশ সেকেন্ড ধরে একই স্বরে বাজলো সে শব্দ। সকাল সোয়া সাতটার সাইরেন, অফিস কর্মীদের ঘুমভাঙ্গার সময়। বিছানা ছাড়লো উইনস্টন। ন্যাংটো সে। আউটার পার্টির একজন সদস্য কাপড়ের জন্য বছরে ৩০০০ কুপন পায়, তার মধ্যে একটি পাজামায়ই খরচ হয়ে যায় ৬০০। তা পরে ঘুমিয়ে নষ্ট করার মানে হয় না। হাত বাড়িয়ে চেয়ারের উপরে রাখা ময়লা গেঞ্জি আর শর্টস তুলে নিলো। তিন মিনিটের মধ্যেই শুরু হবে শরীর চর্চা। এসময় তার উঠলো কাশির দমক। ঘুম থেকে উঠলেই এমনটা হয় উইনস্টনের। এতে তার ফুসফুস পুরোই ফাঁকা হয়ে গেলো। চিৎ হয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ হাঁপানোর পর স্বাভাবিক নিশ্বাস নিতে পারলো। কাশির দমকে তার শিরাগুলো ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম। পাশাপাশি আলসারের ব্যাথাও চাগাড় দিয়ে উঠলো।

‘ত্রিশ থেকে চল্লিশের গ্রুপ!’ কর্কশ নারী কণ্ঠ বেজে উঠলো। ‘ত্রিশ থেকে চল্লিশের গ্রুপ! অনুগ্রহ করে জায়গায় দাঁড়ান। ত্রিশের

থেকে চল্লিশের!…’ টেলিস্ক্রিনের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো উইনস্টন। স্ক্রিনে ততক্ষণে লিকলিকে অথচ পেশীবহুল, জোব্বা গায়ে, শরীর চর্চার জুতো পায়ে তরুণীর মতো দেখতে এক নারীর ছবি ভেসে উঠেছে। ‘হাত বাঁধো, হাত ছাড়ো!’ তারস্বরে বললো মেয়েটি। ‘আমার সঙ্গে সঙ্গে… এক, দুই, তিন চার! এক, দুই, তিন, চার! কাম অন কমরেডস, জীবনের কিছুটা সময় এখানে দাও! এক, দুই, তিন, চার! এক, দুই, তিন, চার!…’

কাশির অমন কঠিন দমকও উইনস্টনের মন থেকে স্বপ্নের জের পুরোপুরি কাটিয়ে দিতে পারেনি। এখন ব্যায়ামের নামে এই যে তালে তালে শরীরটাকে হেলাচ্ছে দোলাচ্ছে তাতে তার মন জুড়ে স্বপ্নের বিষয়গুলোই ফিরে ফিরে আসছিলো। যন্ত্রের মতো হাত দুটো সামনে পেছনে ছুঁড়তে ছুঁড়তে, আর শরীর চর্চায় স্ক্রিনের সামনে যথার্থ মনে করা হয় এমন একটি আত্মতুষ্টির ভাব মুখাবয়বে মেখে নিয়ে, ভাবনার ক্যানভাস জুড়ে ছেলেবেলার সেই অনুজ্জ্বল সময়টিকে নিয়ে আসার অনবরত কসরত চালিয়ে যাচ্ছিলো সে। অস্বাভাবিক কঠিন এক সময় ছিলো তখন। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগটাই একটু আধটু মনে পড়ে। এর আগের সব স্মৃতিই ঝাপসা। বস্তুত এর বাইরের কোন একটি কিছুরই অস্তিত্ব এখন আর নেই যার কথা উল্লেখ করা চলে। এমনকি নিজের জীবনের বাহ্যিক রেখাগুলোও উবে গেছে। অনেক কিছুই আপনার মনে পড়বে, যা আদৌ ঘটেছে কিনা নিশ্চিত করা যাবে না, খুব সম্ভবত ঘটেই নি। আবার অনেক ঘটনার কথা আপনার মনে পড়বে বটে, কিন্তু সেগুলোর পারিপার্শ্বিকতা আবহ এগুলো ধরতে পারবেন না। দীর্ঘ একটা সময় ছিলো স্রেফ শুন্যতার। যখনকার কথা কিছুই মনে পড়ে না। বস্তুত ওই সয়মটিতে আপনি আসলে কিছু করেনও নি, কিংবা করতেও পারেননি। তখনকার সময়টি সবকিছুই ছিলো অন্যরকম। এমনকি দেশগুলোর নাম, মানচিত্রে সেগুলোর আকার, তাও ছিলো ভিন্ন। এয়ারস্ট্রিপ ওয়ানের কথাই ধরুন না। সে সময়ে এই অংশকে বলা হতো ইংল্যান্ড বা ব্রিটেন। তবে উইনস্টনের নিশ্চিত মনে পড়ে লন্ডনকে তখনো লন্ডনই বলা হতো।

তার দেশ যুদ্ধে লিপ্ত নয়, এমন কোনও একটা সময়ের কথা উইনস্টনের মনেই আসে না। তবে শৈশবে এক দীর্ঘ শান্তিবিরতির কথা খুব মনে পড়ে। শৈশবের যত স্মৃতি মনে আসে তার অন্যতম হলো বিমান হামলার এক বিভিষীকাময় দিন। সেদিন সবাইকে বিষ্মিত করে দিয়ে সে হামলা হয়েছিলো। হতে পারে কলচেস্টারে যেবার আনবিক বোমা পড়েছিলো, সেবারেরই ঘটনা। হামলার কথা তার ঠিকঠাক মনে নেই, তবে মনে আছে বাবা শক্তহাতে তার হাতটি ধরে আছেন আর ওরা সবাই মিলে দ্রুত নিচের দিকে নামে যাচ্ছিলো মাটির গভীর সুরঙ্গ পথ ধরে ঘোরানো প্যাঁচানো একটি সিঁড়ি বেয়ে। পায়ের তলার সিঁড়িতে ধপধপ শব্দ হচ্ছিলো। আর সে এতই কাহিল হয়ে পড়েছিলো যে কান্না জুড়ে দিয়েছিলো। এক পর্যায়ে তারা কিছুক্ষণ থেমে জিরিয়েও নেয়। মা তার চিরাচরিত ধীর আর

স্বাপ্নিক ভঙ্গিমার হাঁটাচলায় ঠিক কুলোতে পারছিলেন না ফলে তাদের চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে গিয়ে এগুচ্ছিলেন। তার কোলে শিশু ছোটবোনটি- অথবা হতে পারে স্রেফ একটি কম্বলের বস্তা কাঁখে করেই তিনি নামছিলেন সেই সিঁড়ি বেয়ে। তার নিশ্চিত করে মনে পড়ে না, সে সময় তার ছোট বোনটির জন্ম হয়েছিলো, নাকি হয়নি। অবশেষে তারা একটি স্থানে গিয়ে পৌঁছালো, সেখানে ভীষণ শোরগোল আর হাজারো মানুষের ভীর। তার মনে পড়ে ওটি সম্ভবত একটি টিউব স্টেশনই ছিলো।

পাথর বসানো মেঝেতে বসে ছিলো অনেকে, কয়েকজন করে ঠাসাঠাসি হয়ে কতগুলো ধাতব মঞ্চকের ওপর বসেছিলো, একজনের ওপর দিয়ে আরেকজন। উইনস্টন ও তার বাবা-মা মেঝেতেই একটি স্থান বেছে নিয়েছিলো। আর তাদের কাছেই একটি মঞ্চকে পাশাপাশি বসেছিলো এক বৃদ্ধ আর এক বৃদ্ধা।

বৃদ্ধ লোকটির অভিজাত কালো স্যুট পরা, মাথায় কালো কাপড়ের ক্যাপটি পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়া। তাতে তার ধবধবে সাদা চুলগুলো দেখা যাচ্ছিলো। চেহারাটা ছিলো লালচে, আর চোখ দুটো নীল, অশ্রু ছলছল। জিনের গন্ধ নাকে লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো লোকটির শরীর থেকে ঘাম নয় জিনের গন্ধ ছড়ায়। আর তার চোখ থেকে যে অশ্রু বেরিয়ে আসছে তাও খাঁটি জিন ছাড়া কিছুই নয়। মদিরার প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা ঝিম ধরে থাকলেও লোকটির কষ্ট স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো, যা মোটেই সহ্য করা যাচ্ছিলো না। উইনস্টন তার শিশুমন দিয়েই তখন বুঝে নিয়েছিলো ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেছে এই বৃদ্ধের জীবনে। এমন কিছু যা ক্ষমার অযোগ্য, আবার সে ক্ষতি কোনো কিছু দিয়েই পূরণ হবারও নয়। তার কাছে এও মনে হচ্ছিলো যে সে বুঝতে পেরেছে ঠিক কি হয়েছে। বস্তুত বৃদ্ধ লোকটি যাকে খুব ভালোবাসতো- হতে পারে তার ছোট্ট নাতনিটি, সে সম্ভবত মারা গেছে। কয়েক মিনিট পরপরই বৃদ্ধ লোকটি একটি কথাই বলছিলেন: ‘ওদের বিশ্বাস করা আমাদের উচিত হয়নি। আমি পই পই করে বলেছিলাম, বলো বলিনি? ওদের বিশ্বাস করেই আজ এই ফল হলো! আমি তো গোড়া থেকেই বলেছি। আমাদের এই পায়ুকামীগুলোকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না।’

ওদের ঠিক কোন পায়ুকামীদের বিশ্বাস করা উচিত হয়নি উইনস্টন এখন তা আর মনে করতে পারে না।

আক্ষরিক অর্থে অনেকটা সেই সময় থেকেই যুদ্ধটা চলছে। তবে সত্যি বটে, যুদ্ধটা সবসময় একই রকম ছিলো না। তার ছেলেবেলায় মাসের পর মাস লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় যখনতখন সংঘর্ষ বেঁধে যেতো, এর কোনো কোনোটির কথা স্পষ্ট মনে পড়ে উইনস্টনের। তবে পুরো সময়ের ইতিহাস ঘেঁটে, কে ঠিক কখন কার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলো তা বলা অসম্ভব। কারণ কোনো লিখিত দলিল নেই, নেই কোনো বলে রাখা কথাও।

ঠিক এখন যে যুদ্ধ চলছে তার বাইরে আর কোনও কিছুর কথাই কখনো উচ্চারিত হয় না। এই সময়ে, এই ১৯৮৪ সালে (যদি এটা ১৯৮৪ সাল হয়ে থাকে) ওশেনিয়া ইউরেশিয়ার বিরু্দ্ধে যুদ্ধে রত আর ইস্টেশিয়ার সঙ্গে তার মিত্রতা। কোনও সরকারি কিংবা ব্যক্তিগত উচ্চারণে কখনো কি স্বীকার করা হবে যে একদা এই তিন শক্তির সম্পর্কটি ছিলো ভিন্ন ধারায়। উইনস্টন ভালো করেই জানে, মাত্র চার বছর আগে ওশেনিয়ার যুদ্ধ ছিলো ইস্টেশিয়ার বিরুদ্ধে আর ইউরেশিয়া ছিলো মিত্রশক্তি। তবে এ নিতান্তই এক গোপন জ্ঞান, যা সে ঘটনাক্রমে ধারন করছে, কারণ তার স্মৃতি সন্তোষজনকভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়। অংশীদারীত্বের এই পরিবর্তন কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে হয়নি। ওশেনিয়া ইউরেশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে; মানেই হচ্ছে ইউরেশিয়ার বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ সবসময়ের। এখন যার সঙ্গে তার শত্রুতা, সেই শত্রুতাই শেষ কথা। তার সঙ্গে সন্ধি না ভবিষ্যতে সম্ভব হবে, না অতীতে সম্ভব ছিলো।

কাঁধ দুটি ব্যাথাতুর করে তুলে পিছনের দিকে ঠেলে দিলো উইনস্টন (পশ্চাৎদেশের ওপর দুই হাত চেপে ধরে কোমড়ের উপরের অংশের গোটা শরীর মোচড়ানোর এক ধরনের ব্যায়াম পীঠের পেশিগুলোর জন্য উত্তম) আর তখন সম্ভবত দশ সহস্রতমবারের মতো তার মনে হলো, আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে, এ সব সত্য হতে পারে কিন্তু পার্টি যদি তার হাত অতীত পর্যন্ত বিস্তৃত করে, আর বলে দেয়, এমনটা কখনোই ঘটেনি- তাহলে নিশ্চিতভাবেই তা হবে এই সামান্য নির্যাতন বা মৃত্যু চেয়েও ভয়াবহ।

পার্টি বলছে ওশেনিয়া কখনোই ইউরেশিয়ার সঙ্গে জোট বাঁধেনি। আর সে, উইনস্টন স্মিথ, ভালো করেই জানে, ওশেনিয়া মাত্র চার বছর আগেই ইউরেশিয়ার মিত্র ছিলো। কিন্তু সে জানার অস্তিত্ব কোথায়? তা কেবলই তার সচেতনতায়, যা যেভাবেই হোক যথাশীঘ্র ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আর যদি অন্য সবাই দলের চাপিয়ে দেওয়া মিথ্যা মেনে নেয়- যদি সকল নথিপত্র একই গল্প বলে- তাহলে এই মিথ্যাই ইতিহাসে পর্যবসিত হবে আর তা সত্য বনে যাবে। দলের স্লোগান বলে, ‘অতীত যার নিয়ন্ত্রণে…ভবিষ্যতেও তার নিয়ন্ত্রণ’, ‘বর্তমান যার নিয়ন্ত্রণে, অতীতেও নিয়ন্ত্রণ তারই’। তবে অতীত কখনোই পাল্টায় না। আজ যা সত্য তা চিরদিনের জন্যই সত্য। খুবই সহজ এ সত্য প্রতিষ্ঠা। যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে অব্যাহতভাবে আপনার নিজের স্মৃতিকে জয় করে চলা। ‘বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রণ’ যাকে নিউস্পিকে ওরা বলে ‘দ্বৈতচিন্তা’।

সোজা হও!, ব্যায়াম শিক্ষয়ত্রীর চিৎকার, তবে কিছুটা মোলায়েম স্বরে।

উইনস্টন তার হাত দুটি দুপাশে ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে ফুসফুসটা ভরে নিলো। তার মন চট করে ঢুকে পড়লো দ্বৈতচিন্তার জটিল জগতে। জানতে হবে আবার জানাও যাবে না, সতর্কভাবে যে মিথ্যার গড়ন তার কথনে পূর্ণ সত্যতার সতর্কতা নিশ্চিত করতে হবে, একই সঙ্গে দুটি মত পোষণ করতে হবে, যার দুটিই বাতিল হয়ে যাবে, দুটি মতই পরস্পরবিরোধী জেনেও দুটিতেই বিশ্বাস করতে হবে, যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দ্বার করাতে হবে, যখন নৈতিকতার কথা আসবে তখন তা অস্বীকার করতে হবে, বিশ্বাস রাখতে হবে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব আর দলই কেবল গণতন্ত্রের অভিভাবক, যা কিছু ভুলে যাওয়া প্রয়োজন তা ভুলে যেতে হবে, আর যখন প্রয়োজন হয়ে পড়বে তখনই তা আবার মনে করতে হবে, এবং এর পরপরই আবার তা ভুলে যেতে হবে, আর সর্বোপরি, প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেই ওই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এটাই সুক্ষ্মদর্শীতা: সচেতনভাবে অসচেতনতার প্রয়োগ, এবং অতঃপর আবারো এই মাত্র যে অসচেতনতার কাণ্ডটি ঘটে গেলো তা নিয়েও অসচেতন হয়ে যেতে হবে। বুঝতে হবে, ‘দ্বৈতচিন্তা’ শব্দের মধ্যেই রয়েছে দ্বৈতচিন্তার প্রয়োগ।

ব্যায়াম শিক্ষয়ত্রী ফের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ‘এখন আমরা দেখবো আমাদের মধ্যে কে কে নিজেদের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল ছুঁতে পারি,’ বেশ খানিকটা উৎসাহের সঙ্গেই বললেন তিনি। ‘ঠিক নিতম্বের ওপর দিকটা ভাজ করে, আসুন কমরেডরা, আসুন এক-দুই! এক-দুই!’

ব্যায়ামটাকে স্রেফ ঘৃণা করে উইনস্টন। এতে তার পায়ের গোড়ালি থেকে নিতম্ব পর্যন্ত ব্যাথায় টন টন করতে থাকে। আর প্রায়শই আরেক দমক কাশি ধরিয়ে ছাড়ে। এত ভাবনার মাঝে মুখে মাখা আধাসন্তুষ্টির অভিব্যক্তিটি উবে গেছে। ফের ভাবনা শুরু, অতীতকে পাল্টে দেওয়া হয়নি, আসলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। যখন সবচেয়ে ধ্রুব সত্যটিরও অস্তিত্ব আপনি আপনার নিজের স্মৃতির বাইরে আর কোথাও খুঁজে পাবেন না, তখন তা কিভাবেই বা প্রতিষ্ঠিত করবেন? ঠিক কোন বছর বিগ ব্রাদারের কথা তার প্রথম কানে এসেছিলো, সে কথাটি মনে করার চেষ্টা করলো, মনে হলো ষাটের দশকের কোনও একটি সময়েই হবে, তবে ঠিক নিশ্চিত করা অসম্ভব। দলের ইতিহাসে দেখানো হচ্ছে বিগ ব্রাদার বিপ্লবের একেবারে গোড়ার দিনগুলো থেকেই এর নেতা আর অভিভাবক হয়ে আছেন। তার বীরত্বগাঁথা ধীরে ধীরে পেছন থেকে আরও পেছনের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হচ্ছে যা এরই মধ্যে চল্লিশের দশক ছাড়িয়ে ত্রিশের দশকের অনুপম বিশ্বের সময় অবধি পৌঁছে গেছে, যখন পুঁজিপতিরা অদ্ভুত সিলিন্ডার আকৃতির হ্যাট চাপিয়ে চকচকে মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে কিংবা কাঁচ বসানো ঘোড়ার-শকটে চেপে লন্ডনের রাস্তায় দাবড়ে বেড়াতেন। তার জানা নেই এইসব লৌকিক উপাখ্যানের কতটা সত্য আর কতটা বানোয়াট। উইনস্টনের এও মনে পড়ে না কোন তারিখে এই পার্টিরই জন্ম হলো। ১৯৬০ এর আগে ইংসক শব্দটি একটি

বারের জন্যও শুনেছে বলে সে বিশ্বাসই করে না। তবে হতে পারে ওল্ডস্পিকে ফর্মটি ছিলো ‘ইংলিশ সোশ্যালিজম’, সেদিক থেকে বলা যায় অতীতেও এর অস্তিত্ব ছিলো। সবকিছুই ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন। কখনো একটি সুনির্দিষ্ট মিথ্যার ওপর আপনি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারবেন না। ধরুন, পার্টির ইতিহাস বইগুলোতে দাবি করা হয়েছে, পার্টি বিমানের আবিষ্কারক। কিন্তু এটা অসত্য, এমন কোন তথ্যপ্রমাণই নেই। সারা জীবনে কেবল একটি বার তার হাতে পড়েছিলো ঐতিহাসিক সত্যকে মিথ্যায়নের নির্ভুল প্রমাণ্য দলিল। আর সে ঘটনায়-

‘স্মিথ!’ টেলিস্ক্রিন থেকে কর্কশ চিৎকার ভেসে এলো। ‘৬০৭৯। স্মিথ ডব্লিউ.! হ্যাঁ, তুমি, নিচে ঝোঁকো! তুমি এর চেয়ে ভালো পারো। তুমি চেষ্টা করছো না। আরও নিচে, প্লিজ! এবার ভালো হচ্ছে, কমরেড। এবার সবাই আরামে দাঁড়াও, আর আমাকে দ্যাখো।’

হঠাৎ উইনস্টনের সারা শরীর দিয়ে গরম ঘাম ছুটলো। চেহারাটি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হয়েই থাকলো কিছুটাক্ষণ। হতাশার অভিব্যক্তি নেই। নেই ক্ষোভেরও প্রকাশ। চোখের পলকে অভিব্যক্তি পাল্টে গেলো। সোজা দাঁড়িয়ে ব্যায়াম শিক্ষিকার মাথার ওপর তুলে ধরা বাহুদুটিতে নজর তার। আহ! সুন্দর!, হাতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এমনটা হয়তো কেউই বলবে না, তবে একটা স্বাস্থ্যসম্মতা ও দক্ষতার প্রকাশ রয়েছে- নীচু হলেন ব্যায়াম শিক্ষিকা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দুটির নিচের প্রথম ভাঁজ পর্যন্ত মাটিতে ছুঁয়ে দিলেন।

‘ওয়ান-টু-থ্রি, কমরেডস! আমি চাই ঠিক এভাবেই করে দেখাও তোমরা সবাই। আমাকেই দেখো। আমার এখন ঊনচল্লিশ। চার সন্তানের মা।’ এরপর আবারও নিচু হলেন ব্যায়াম শিক্ষিকা। ‘তোমরা দেখতে পাচ্ছো আমার হাঁটু একটুও ভাঁজ হয়নি।’ ‘তোমরা সবাই চাইলেই এটা করতে পারো,’ আবার সোজা হতে হতে বললেন তিনি।

‘পঁয়তাল্লিশের নীচে যে কেউ সহজেই নীচু হয়ে তাদের পা ছুঁয়ে দিতে পারবে। আমাদের সবার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লড়াই করার সুযোগ নেই। কিন্তু আমরা অন্তত আমাদের নিজেদের ফিট রাখতে পারি। মনে রেখো আমাদের ছেলেরা মালাবার যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ছে! নাবিকেরা রয়েছে ভাসমান দূর্গে! একবার চিন্তা করো ওদের কত ঝুঁকিই না নিতে হচ্ছে। এখন আবার চেষ্টা করো কমরেডরা, এবার অনেক ভালো হচ্ছে,’ বলছিলেন ব্যায়াম শিক্ষিকা। আর ঠিক তখনই উইনস্টন প্রাণপন চেষ্টায় তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল ছুঁয়ে দিলো। গত ক’বছরে এই প্রথম সে কাজটি করতে পারলো।

চতুর্থ অধ্যায়

টেলিস্ক্রিনটা পাশেই, কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই উইনস্টনের। গজরাতে গজরাতে স্পিকরাইট যন্ত্রটি টেনে নিলো, ফুঁ দিয়ে মাউথপিসের ধুলো সরালো, চশমা পরলো। এভাবেই শুরু হলো দিনের কাজ। ডেস্কের ডান দিকে রাখা নিউমেটিক টিউব থেকে চারটি কাগজের সিলিন্ডার বের করে একটা একটা করে প্যাঁচ খুলে খুলে ক্লিপে লটকালো।

খুপড়ির দেয়ালে তিনটি প্রকোষ্ঠ। স্পিকরাইট যন্ত্রের ডানে একটিতে ছোট নিউমেটিক টিউব। যার ভেতরে লিখিত বার্তাগুলো আসে। বাঁয়ের খোপটি অপেক্ষাকৃত বড়, সংবাদপত্রের জন্য বরাদ্দ। আর পাশ দেয়ালে, উইনস্টনের হাতের নাগালের মধ্যে অপর প্রকোষ্ঠের আয়তকার মুখ ইস্পাতের গরাদ দিয়ে শক্ত করে আটকানো। এটি মূলত একটি গহ্বর। অকেজো, নষ্ট কাগজের গন্তব্যস্থল। গোটা ভবনে এমন হাজার হাজার অথবা লাখ, লাখ গহ্বর রয়েছে। কেবল যে কামরা গুলোতে তাই নয়, বারান্দায়ও একটু পরপরই এমন গহ্ববরের মুখ দেখা যায়। কি কারণেই যেনো এগুলোর নাম হয়ে গেছে ‘স্মৃতি গহ্বর’। যে যখনই জানবে কোনও একটি নথি ধ্বংস করতে হবে, অথবা যখনই কোনও একটি কাগজের টুকরো পড়ে থাকতে দেখবে তখন স্বয়ংক্রিয় কাজটিই হবে সেটি তুলে নেওয়া আর কাছের স্মৃতি গহ্বরে ফেলে দেওয়া। সেখানে ওটি গিয়ে পড়বে প্রবাহমান তপ্ত বাতাসে, যা উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে মস্ত এক হাপরের ভেতর। এই মস্ত ভবনের কোনও এক গোপন স্থানে হা করে আছে সেই হাপর। যে চারটি কাগজ উইনস্টন খুললো সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলো সে। প্রতিটিতেই এক কিংবা দুই লাইনের একটি করে বার্তা লেখা, সংক্ষেপিত সাংকেতিক ভাষায়। এগুলো নিউস্পিকের ভাষা নয়, তবে নিউস্পিকের শব্দের ব্যবহার রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ কাজে এই ভাষার ব্যবহার চলে। যেমন লেখা আছে: টাইমস ১৭.০৩.৮৪ বিবি স্পিচ ম্যালরিপোর্টেড আফ্রিকা রেক্টিফাই টাইমস ১৯.১২.৮৩ ফোরকাস্টস ৩ ওয়াইপি ফোর্থ কোয়ার্টার ৮৩ মিসপ্রিন্টস ভেরিফাই কারেন্ট ইস্যু। টাইমস ১৪.২.৮৪ মিনিপ্লেন্টি ম্যালকোটেড চকোলেট রেক্টিফাই টাইমস ৩.১২.৮৩ রিপোর্টিং বিবি ডেঅর্ডার ডাবলপ্লাসানগুড রেফস আনপারসনস রিরাইট ফুলওয়াইজ আপসাব অ্যান্টেফিলিং।

ভালোলাগার একটা হালকা আবেশে চতুর্থ বার্তাটি পাশে সরিয়ে রাখলো উইনস্টন। শেষের এই বার্তাটি জটিল এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। বাকিগুলো নিয়মমাফিক, গতানুগতিক কিছু বিষয়। তবে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কতগুলো পরিসংখ্যানের তালিকা নিয়ে ফালতু খাটুনি আছে।

টেলিস্ক্রিনে পেছনের নম্বরগুলো ঘুরিয়ে ‘দ্য টাইমস’ এর পুরোনো পত্রিকাগুলো বের করে নিলো উইনস্টন। মিনিক কয়েক সময়, এর মধ্যে

কাজ না সেরে ফেললে ওগুলো দ্রুতই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিউমেটিক টিউবে ঢুকে পড়বে। যে বার্তাগুলো এখন তার কাছে আছে এগুলোর ভিত্তিতে সংবাদপত্রটির পুরোনো সংখ্যার সংশ্লিষ্ট খবর বা নিবন্ধে পরিবর্তন আনতে হবে। ওরা বলে শুদ্ধিকরণ। যেমন ধরুন, টাইমসের ১৭ মার্চের সংখ্যায় ছাপা হয়েছে, বিগ ব্রাদার তার আগের দিনের বক্তব্যে ধারনা ব্যক্ত করেছিলেন, দক্ষিণ ভারত যুদ্ধক্ষেত্র শান্ত থাকবে আর ইউরেশীয়রা হামলা চালাবে উত্তর আফ্রিকায়। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটলো তা হচ্ছে ইউরেশীয় হায়ার কমান্ড দক্ষিণ ভারতে হামলা চালালো আর উত্তর আফ্রিকায় কিছুই ঘটলো না। এতে টাইমসের রিপোর্টের ওই অনুচ্ছেদে সংশোধনী প্রয়োজন হয়ে পড়লো। এমনভাবে সংশোধন হলো যেনো বিগ ব্রাদার যা ভেবেছিলেন ঠিক তেমনটিই ঘটেছে যুদ্ধক্ষেত্রে। অথবা ধরুন ১৯ ডিসেম্বরের টাইমস সংখ্যায় প্রকাশিত ১৯৮৩ সালের শেষ তিন মাসের ভোক্তা সামগ্রীর শ্রেণিবিণ্যাস করে পূর্বাভাস প্রতিবেদনের ওপর তৈরি রিপোর্টের কথা। এটি ছিলো একই সাথে নবম ত্রি-বার্ষিক পরিকল্পনার ষষ্ঠ কোয়ার্টারও। আজকের সংখ্যায় রয়েছে ওই প্রতিবেদনটি প্রকাশের খবর, তাতে দেখা যাচ্ছে পূর্বাভাসে যা কিছু বলা হয়েছিলো তার অনেককিছুতেই বড় বড় ভুল হয়ে গেছে। এখন উইনস্টনের কাজ হচ্ছে আনকোরা রিপোর্টের তালিকা আর পরিসংখ্যান ধরে পুরোনো রিপোর্টের ভুলগুলো শুধরে দেওয়া। তৃতীয় বার্তাটিতে ছোট্ট একটি ভুল যা শুধরে দেওয়া মিনিট কয়েকের কাজ। মাত্র গত ফেব্রুয়ারিতে প্রাচুর্য মন্ত্রণালয় থেকে একটা অঙ্গীকারনামা প্রকাশিত হয় (দাপ্তরিক ভাষায় নিঃশর্ত অঙ্গীকারনামা) যাতে বলা হয় ১৯৮৪ সালে চকোলেট রেশনিং কমানো হবে না। উইনস্টন নিশ্চিত করেই জানে এ সপ্তাহের শেষদিকে চকোলেট রেশনিং কমিয়ে ত্রিশ গ্রাম থেকে বিশ গ্রাম করার ঘোষণা আসছে। তাকে কেবল একটি কাজই করতে হবে তা হচ্ছে, ওই অঙ্গীকারনামার পরিবর্তে একটি সতর্কবানী লিখতে হবে এই ভাষায় যে, এপ্রিলের কোন এক সময় রেশন কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে।

একেকটি বার্তা নিয়ে উইনস্টন যখন কাজ করে তখন সে স্পিকরিটেন সংশোধনীগুলো দ্য টাইমসের মূল কপির সঙ্গে গেঁথে দ্রুত নিউমেটিক টিউবে ঢুকিয়ে দেয়। কাজটি শেষ হতে না হতেই চরম অবচেতনার মাঝেও বার্তার মূল কপিটিসহ সে নিজে যদি কোনো নোট নিয়ে থাকে সেগুলো সব দলামোচা করে দ্রুত স্মৃতি গহ্বরে ফেলে দেয় আগুন-বাষ্পের খাদ্য হিসেবে।

যে অদৃশ্য কুঠুরির ভেতর এই নিউমেটিক টিউব চলে যাচ্ছে সেখানে ঠিক কি হয় তা পুঙ্খানুপুঙ্খু জানেনা উইনস্টন। তবে এ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারনা সে রাখে। দ্য টাইমসের কোনও একটি সংখ্যায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়ে গেলে সাথে সাথেই তা সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। এরপর দ্রুত ওই বিশেষ সংখ্যাটি পুনঃমুদ্রণ করে ফেলা

হয় আর মূল সংখ্যার সকল কপি ধ্বংস করা হয়। আর্কাইভের ফাইলে পুরোনো কপির বদলে স্থান করে নেয় নতুন কপি।

বদলে ফেলার এই চর্চার প্রয়োগ যে কেবলই সংবাদপত্রের সংখ্যায়, তা নয়, পুস্তক, সাময়িকী, প্রচারপত্র, প্যাম্ফেলেট, পোস্টার, লিফলেট, চলচ্চিত্র, শব্দবার্তা, কার্টুন, ছবি থেকে শুরু করে যে কোনো সাহিত্যকর্ম বা প্রামাণ্য দলিল পর্যন্ত যা কিছু রাজনৈতিক বা আদর্শিকভাবে গুরুত্ববহন করে তার সব কিছুই এর অন্তর্ভূক্ত। এভাবেই দিনের পর দিন বলা যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মিনিটের পর মিনিটেই অতীতকে করে তোলা হচ্ছে পাকাপোক্তভাবে নির্ভুল। এভাবেই পার্টির প্রতিটি অনুমান দালিলিক প্রমাণসহ হয়ে উঠছে ভ্রান্তিহীন। তা হোক কোনও সংবাদ, অথবা কোনও মতের প্রকাশ, সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে যার মিল নেই তার নথিটি থাকারও অবকাশ নেই। সকল ইতিহাসই আদতে একটি পাণ্ডুলিপি যা ঘষে পরিষ্কার করা হয়েছে, নয়তো ঠিক যখনই প্রয়োজন হয়েছে লিখে ফেলা হয়েছে নতুন করে। কাজ যখন শেষ তখন তার মধ্যে কোনও ভ্রান্তি ছিলো এমনটা প্রমাণের এতটুকু সুযোগ রাখা হয়নি। রেকর্ডস বিভাগের সবচেয়ে বড় অংশটি উইনস্টন যে অংশে কাজ করে তার চেয়ে অনেক অনেক গুন বড়। সেখানে কেবল তাদেরই গতায়ত যারা এই ভুল ধরার কাজে আর বাতিল করা হয়েছে এবং ধ্বংস করা হবে এমন বই, খবরের কাগজ এবং অন্যান্য নথি সংগ্রহের কাজে ন্যস্ত। দ্য টাইমসের যে সব সংখ্যায় রাজনীতির নতুন মেরুকরণ কিংবা বিগ ব্রাদারের ভুল ভবিষ্যবচনে বারবার পুনর্লেখন হয়েছে সেগুলো তার পুরোনো তারিখ নিয়েই নথিভুক্ত হয়ে আছে। এই কপির বাইরে ওই সংখ্যার আর একটি কপিরও অস্তিত্ব রাখা হয়নি, যা এই অসামঞ্জস্যতার প্রমাণ হিসেবে খাড়া হতে পারে। বইগুলোও বার বার জব্দ করা হয়েছে, নতুন করে লেখা হয়েছে এবং অকপটে তা ফের বাজারে ছাড়া হয়েছে। একটিবারের জন্যও কোথাও স্বীকার করে নেওয়া হয়নি, বলা হয়নি যে এতে কিছু পরিবর্তন আনা হলো। এমনকি লিখিত যেসব নির্দেশনা উইনস্টনের হাতে আসে, কাজ শেষ হওয়া মাত্র যেগুলোর অস্তিত্ব সে নিজেই বিলীন করে দেয়, তাতেও কোনও দিন বলা হয়নি যে ওটি ছিলো নিজেদের ভুল, বরং বলা হয়েছে যা লেখা হয়েছে তা ভুল, মুদ্রণপ্রমাদ কিংবা ভ্রান্ত উদ্ধৃতি যা শুদ্ধতার খাতিরেই নতুন করে লেখা প্রয়োজন।

বস্তুতঃ প্রাচুর্য মন্ত্রণালয়ের নথিতে যখন পরিসংখ্যানগুলো পাল্টে দিচ্ছিলো তখন উইনস্টনের কাছেও বিষয়টি প্রতারণা বলে মনে হচ্ছিলো না। একটি ফালতু জিনিষ দিয়ে আরেকটি ফালতু জিনিষের প্রতিস্থাপন ছাড়া এটি আর কিছুই নয়। যা কিছুই হচ্ছে তার অধিকাংশেরই সঙ্গে বাস্তব জগতের কোনো কিছুর সম্পর্ক নেই। সবকিছুই যেন কেবলই মিথ্যা, কেবলই জালিয়াতি। পরিসংখ্যানগুলো তার মূল সংখ্যায় যেমন তামাশা, শুদ্ধিকরণের পরও একই তামাশা। চাইলেই এগুলো

মাথা থেকে সরানো যাবে না। যেমন ধরুন প্রাচুর্য মন্ত্রণালয় তার পূর্ব ধারনা দিলো সিকি বছরে ১৪৫ মিলিয়ন জোড়া জুতো তৈরি হবে।
কিন্তু বাস্তবে তা গিয়ে দাঁড়ালো ৬২ মিলিয়ন জোড়ায়। এখন উইনস্টন পূর্ব ধারনার সংশোধনীতে লিখে দিলো ৫৭ মিলিয়ন জোড়া। যাতে দাবি করা যায়, কোটা যা ছিলো তার চেয়ে বেশিই তৈরি হয়েছে। যাই বলুন না কেন, ৬২ মিলিয়নের হিসাবটি না ১৪৫ মিলিয়ন হিসাবের ধারে কাছের, না ৫৭ মিলিয়নের। আর এটা ভাবলেও অবাস্তব ভাবা হবে না যে, আদৌ কোনও জুতোই প্রস্তুত হয়নি। তবে অতীব বাস্তব কথা এই যে, কেউ কখনোই জানবে না, সত্যিকারে কতগুলো জুতো প্রস্তুত হয়েছে, আর কেউ তা জানতে চাইবেও না। সবাই কেবল এটাই জানবে অতি বৃহৎ সংখ্যায় জুতো প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত চিত্র হতে পারে ওসেনিয়ার অর্ধেক লোকই নগ্নপায়ে পথ চলছে। নথিভুক্ত সকল তথ্যেরই একই দশা, হোক সে ছোট কিংবা বড়। সবকিছুই মিলিয়ে যাচ্ছে এক ছায়া-পৃথিবীর দিকে, আর তাতে শেষাবধি বছরের তারিখটা পর্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

হলের চারিদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিলো উইনস্টন। উল্টোদিকের একই আকৃতির আরেকটি খুপড়িতে ছোট সুক্ষ্ম চেহারার কালো থুতনিওলায়া লোকটি, নাম টিলোটসন, অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। হাঁটুর ওপর ভাঁজ করা একটি সংবাদপত্র আর মুখটা স্পিকরাইটের মাউথপিসের সঙ্গে লাগোয়া। টেলিস্ক্রিনের সঙ্গে তার গোপন কথা চলছে এমন একটা আবহ তৈরি করে নিয়েছে চারিদিকে। এরই মাঝে চশমার ভেতর দিয়ে উইনস্টনের দিক একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানলো সে।

টিলোটসনকে ভালো করে চেনে না উইনস্টন। সে কি কাজ করে তাও তার জানা নেই। রেকর্ডস ডিপার্টমেন্টের লোকেরা তাদের কাজ নিয়ে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। লম্বা জানালাবিহীন হলে, দুই সারিতে ছোট ছোট কামরা থেকে অবিরাম কাগজের খসখসানি আর স্পিকরাইটে টানা কথা বলার ঝিমধরা গুনগুনানি ভেসে আসে। এই হলের ভেতর ডজন খানেক লোকতো হবেই যাদের এমনকি নাম অব্দি জানা নেই উইনস্টনের। তবে প্রায় প্রতিদিনই বারান্দা ধরে তাদের হন্তদন্ত ছোটাছুটি দেখে, আর দুই মিনিটের ঘৃণা কর্মসূচিতে তাদের দেখা মেলে চিৎকার চেচামেচিতে সামিল। পাশের কামরার ধুসরকেশীর কথা সে জানে, দিনের পর দিন মেয়েটি হাপিস করে দেওয়া হয়েছে এমন মানুষদের নাম-ঠিকুজি খুঁজে বের করে চিরতরে মুছে দেওয়ার কাজেই ন্যস্ত। কাজটি তার মতো আর কে-ই পারবে! কারণ বছর কয়েক আগে তার স্বামীকেই তো এমনভাবে বাষ্পায়িত করে দেওয়া হয়েছিলো। কয়েকটা খুপড়ির পরের খুপড়িতে শান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, স্বাপ্নিক চেহারার মানুষটির কথাও বলা যায়। নাম অ্যাম্পলফোর্থ। কান ভর্তি চুল, বিষ্ময়কর গানের গলা। আর কাজটি হচ্ছে যে কোনও কিছুর বিকৃত রূপ দেওয়া। কবিতার পংক্তিমালা যদি আদর্শবিরোধী হয়, আর তা যদি কোনও কারণে সংকলনে রেখেই দিতে হয়

তাহলে সেগুলো বিকৃতরুপ পায় অ্যাম্পলফোর্থের হাতে। এই হলে, জনা পঞ্চাশেক, বা তার কমবেশি লোক কাজ করে যা মূলত বিশাল জটিলতা ভরা রেকর্ডস বিভাগের একটি উপ-বিভাগ মাত্র। পেছনে, উপরে, নীচে আরও ঝাঁকে-ঝাঁকে কর্মী কল্পনাতীত লাখো কাজে ন্যস্ত। রয়েছে বিপুল সংখ্যক মুদ্রণ-দোকান, তাদের সহ-সম্পাদকের দল, দক্ষ মুদ্রাক্ষরিক, আর ভুয়া ছবি তোলার জন্য যন্ত্রপাতি সজ্জিত বিশাল স্টুডিও। এখানে একটি টেলি-প্রোগাম বিভাগ রয়েছে। তাতে রয়েছেন প্রকৌশলী, প্রযোজক আর অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল, যাদের বাছাই করা হয় কণ্ঠ নকল করার দক্ষতার মাপকাঠিতে। রয়েছে একদল অভিসম্বদ্ধ করনিক যাদের কাজ হচ্ছে স্রেফ যেসব বই আর সাময়িকি পাল্টে দিতে হবে সেগুলো তালিকা বানানো। বড় বড় গুদামঘর রয়েছে যাতে মজুদ হয় সংশোধিত নথিপত্র, আর রয়েছে লুক্কায়িত চুল্লি যাতে মূল কপিগুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। এবং কোথাও বা অন্যখানে রয়েছে একেবারেই অজ্ঞাতনামা মস্তিষ্কধারীরা, যারা পুরো কাজটির সমন্বয় করছেন, আর নীতি রেখা তৈরি করে দিচ্ছেন যার ভিত্তিতে অতীতের কিছু কিছু বিষয় সংরক্ষিত হচ্ছে, কিছু করা হচ্ছে মিথ্যায়নে সিদ্ধ আর অন্যসব কিছুর অস্তিত্বই ঘষে ঘষে বিলীন করে দেওয়া হচ্ছে।

রেকর্ডস ডিপার্টমেন্ট, যা সত্যমন্ত্রণালয়ের একটি শাখামাত্র, তার প্রাথমিক কাজ এই অতীতকে পুনর্গঠন করা নয় বরং ওসেনিয়ার নাগরিকদের জন্য সংবাদপত্র প্রকাশ, চলচ্চিত্র নির্মাণ, পাঠ্যবই ছাপানো, টেলিস্ক্রিনের কর্মসূচি সম্প্রচার, নাটক, উপন্যাস তৈরি ইত্যাদি- যাতে সন্নিবেশিত থাকবে মেনে নেওয়ার মতো সকল তথ্য, নির্দেশনা আর বিনোদন। ভাস্কর্য নির্মাণ থেকে স্লোগান বানানো, কবিতার পঙক্তি রচনা থেকে জৈব গবেষণা-বিশ্লেষণ, শিশুশিক্ষার বর্ণমালা পুস্তক থেকে নিউস্পিকের অভিধান রচনা পর্যন্ত সবই তাদের দায়িত্ব। আর মন্ত্রণালয় যে কেবল দলের বহুমাত্রিক প্রয়োজন মেটাতে কাজ করে যাচ্ছে তাই নয়, নিচু শ্রেণির মানুষগুলোর জন্য উপকারী, উপযোগী ও উপভোগ্য প্রায়োগিক সকল কর্মযজ্ঞের ভারও তাদের হাতে। এই শ্রেণির জন্য সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক আর বিনোদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেও ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এখানে ফালতু নিম্নমানের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় যাতে খেলা, অপরাধ আর রাশিফল ছাড়া কিছুই থাকে না। সস্তা দরের যৌন উত্তেজক উপন্যাস, যৌনতায় ভরা চলচ্চিত্র, আর সস্তা আবেগস্পর্শী গীত রচিত হয় স্রেফ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে, লিখনযন্ত্র বলে পরিচিত এক বিশেষ ধরনের ক্যালিডোস্কোপের ব্যবহারে। আরও একটি পূর্ণাঙ্গ উপ-বিভাগ রয়েছে, নিউস্পিকে যাকে বলে পর্নোসেক, যা সবচেয়ে নিচু দরের পর্নোগ্রাফি তৈরি করছে, সেগুলো আবার সিলকরা প্যাকেটে বাইরে যাচ্ছে। পার্টির যারা এর নির্মাণ কাজে সম্পৃক্ত তারা ছাড়া আর সকল সদস্যের জন্যই এসব নিষিদ্ধ পণ্য।

উইনস্টন যখন কাজ করে যাচ্ছিলো সেই সময়ের মধ্যেও নিউমেটিক টিউব থেকে আরও তিনটি বার্তা বের হয়, ওগুলো স্বাভাবিক কিছু বিষয়ের ওপর, নিত্য রুটিনে দুই মিনিটের ঘৃণা কর্মসূচির শুরুর আগেই ওগুলো সেরেও ফেলে সে। আর ঘৃণা কর্মসূচি শেষ করে কামরায় ফিরে তাক থেকে নিউস্পিক অভিধান নামিয়ে নেয়, স্পিকরাইটটি একদিকে সরিয়ে রেখে, চশমার কাচ পরিষ্কার করে সকালের কাজে মনোনিবেশ করে।

কাজই উইনস্টনের জীবনের পরম আনন্দ। বেশিরভাগই গৎবাঁধা বিরক্তিকর একঘেঁয়ে কাজ, তারপরেও কিছু কিছু থাকে ভীষণ কঠিন আর জটিল। আপনি চাইলে নিজেকে ওই কাজের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে পারবেন ঠিক যেমন জটিল গণিতের অংক মেলাতে কেউ কেউ নিজেকে তার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। প্রতারণামূলক বার্তাগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে আপনি ইংসকের নীতিসম্পর্কিত জ্ঞান আর দল কি বলতে চায় তা নিয়ে অনুমান করার বাইরে নিজেকে পরিচালনা করার মতো নির্দেশিকা আর কিছুমাত্র পাবেন না। এই কাজটা উইনস্টন ভালোই করে। মাঝে মধ্যে তাকে বিশ্বাস করে সম্পূর্ণ নিউস্পিকে লেখা ‘দ্য টাইমস’ এর প্রধান প্রধান নিবন্ধগুলো শুদ্ধিকরণের দায়িত্বও দেওয়া হয়। পাশে সরিয়ে রাখা বার্তার কাগজটির প্যাঁচ খুলে নিলো উইনস্টন। এতে লেখা আছে-

টাইমস ৩.১২.৮৩ রিপোর্টিং বিবি ডেঅর্ডার ডাবলপ্লাসআনগুড রেফস আনপারসনস রিরাইট ফুলওয়াইজ আবসাব অ্যান্টেফিলিং।

ওল্ডস্পিকে (অথবা প্রমিত ইংরেজিতে) এর মানে দাঁড়ায়: ১৯৮৩ সালের ৩ ডিসেম্বরের দ্য টাইমস সংখ্যায় বিগ ব্রাদারের ‘দিনের নির্দেশ’ নিয়ে তৈরি প্রতিবেদনটি ভীষণভাবে অসন্তুষ্টিজনক এবং এতে অস্তিত্বহীন মানুষের রেফারেন্স রয়েছে। এটি পুরোপুরি পুনর্লেখন করো এবং ফাইলবদ্ধ করার আগে খসড়া উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দাও।

অসন্তুষ্টির কারণ হওয়া ওই গোটা নিবন্ধটি পড়ে ফেললো উইনস্টন। বিগ ব্রাদারের ‘দিনের নির্দেশে’ এফএফসিসি নামে পরিচিত একটি সংস্থার কাজের প্রশংসাই প্রাধান্য পেয়েছে। সংস্থাটি ভাসমান ঘাঁটিগুলো সৈনিকদের সিগারেট আর অন্যান্য আরামসামগ্রী সরবরার করে। কমরেড উইদারস নামে ইনারপার্টির একজন প্রধানসারির সদস্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে অর্ডার অব কনস্পিশাস মেরিট, সেকেন্ড ক্লাস তকমা দেওয়া হয়েছে।

মাস তিনেক পরে এই এফএফসিসি কোনও কারণ না দেখিয়েই হঠাৎ বিলুপ্ত করে দেওয়া হলো। যে কেহই বুঝবে, উইদারস ও তার সঙ্গীরা ক্ষেপে আছে, কিন্তু সে নিয়ে সংবাদপত্র বা টেলিস্ক্রিনে একটা খবরও নেই। এমনটাই প্রত্যাশিত। কারণ, রাজনৈতিক অপরাধীদের বিচার কিংবা এমনকি

জনসম্মখে নাজেহাল করা হয়েছে এমন নজির নেই। এই যে হাজার হাজার মানুষকে সম্পৃক্ত করে গণ আদালতে বিশ্বাসঘাতক আর চিন্তা- অপরাধীদের বিচার হয়, যে বিচারে অপরাধ স্বীকার করে নেওয়ার পর তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয় তা লোক দেখানো মাত্র। বছর কয়েকে এক-আধবার এমনটা ঘটে বৈতো নয়! কিন্তু খুব সাধারণত যা হয়, তা হচ্ছে, দলের নাখোশের কারণ হলে ঠিক হাপিশ হয়ে যাবে, তার কথা আর কোনও দিন উচ্চারিতও হবে না। কারো কাছে কখনোই কি ঘটেছে তার ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র চিহ্নটিও থাকবে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমনকি তাদের মৃত্যু নাও হতে পারে। নিজের বাবা-মাকে ছাড়াও উইনস্টন ব্যক্তিগতভাবেই আরও অন্তত ত্রিশ জনের কথা জানে যারা এভাবেই গুম হয়ে গেছে।

একটি পেপার ক্লিপ দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চুলকাচ্ছিলো উইনস্টন। উল্টোদিকের খুপড়িতে কমরেড টিলোটসন তখনও স্পিকরাইট নিয়ে গোপনীয়তার আবহ ছড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এক মুহূর্তের জন্য মাথাটি তুললেন, এতে চশমার আলোয় তীব্র একট ঝিলিক চোখে লাগলো। উইনস্টনের ধন্ধ জাগলো, কমরেড টিলোটসনও কি একই কাজে ন্যস্ত ঠিক যে কাজটি সে এখন করছে। এটা অসম্ভব কিছু না। এমন একটি জটিল কাজের জন্য মাত্র একজনের ওপর কখনোই ভরসা করা হয় না। অন্যদিকে, এটি যখন কোনও কমিটির কাছে জমা পড়বে তখন জাল করার বিষয়টি প্রকাশ্য হয়ে যাবে। এটা খুবই সম্ভব, ওই দিন বিগ ব্রাদার সত্যিই যা বলেছিলেন তা তুলে রাখতে বিরোধী পক্ষ অন্তত ডজন খানেক লোক লাগিয়ে রেখেছিলো। আর এখন ইনার পার্টির কোনও এক বিশাল মস্তিষ্ক এটি অথবা অন্য ভার্সনটি নির্বাচন করবেন, তার ওপর সম্পাদনার কলম চালাবেন, প্রয়োজন মাফিক ক্রস চেক করে নেবেন এবং অবশেষে কোনও একটি মিথ্যাকে পছন্দ করে নেবেন যা স্থায়ীভাবে নথিভুক্ত হয়ে যাবে এবং সেটাই সত্যে পরিণত হবে।

উইনস্টন জানে না উইদারসকে কেনো শাস্তি পেতে হলো। হতে পারে দুর্নীতির জন্য নয়তো অযোগ্যতার জন্য। অথবা হতে পারে অতি- জনপ্রিয় কোনো অধস্তনকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিগ ব্রাদার। হতে পারে উইদারস কিংবা তার ঘনিষ্ঠ কেউ সন্দেহভাজন ঐতিহ্যানুগ ছিলেন। অথবা হতে পারে- যার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি- এই যে উবিয়ে দেওয়া বা বাষ্পায়িত করা সরকারযন্ত্রের এক অতি প্রয়োজনীয় কাজ আর সে কারণেই এমনটা ঘটেছে। একমাত্র বাস্তব ক্লু থেকে যায় ‘রেফ আনপারসন্স’ শব্দটির মধ্যে, যা এই নির্দেশ করে যে, উইদারস এখন আর কেউ নন। তবে কেউ যখন গ্রেফতার হয় তখনই ভেবে বসলে চলবে না যে, পরিনতি এমনটাই হতে যাচ্ছে। কখনো কখনো তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় আর এক বা দুই বছর চলে তাদের স্বাধীন ঘোরাঘুরি, অতঃপর একদিন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে যায়। খুব কম, কিন্তু এও হয়, সবাই জানে কোনও এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে কিন্তু অনেক পরে হঠাৎ একদিন

ভুতের মতো তার দেখা মিলবে কোনও এক গণ বিচারের দিনে, সেখানে নিজেই নিজের মুখে আরও শত শত মানুষের মতো অপরাধ স্বীকার করে নেবে আর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে যাবে। উইদারস, এরই মধ্যে যাকে ‘আনপারসন’ বলে দেওয়া হয়েছে, তার কোন অস্তিত্ব নেই, আর কোনও কালেই ছিলো না। উইনস্টন ঠিক করলো বিগ ব্রাদারের বক্তব্যের ধরন পাল্টে দেওয়াই যথেষ্ট হবে না, বরং মূল বিষয়ের সঙ্গে আদৌ সম্পর্কিত নয় এমন একটা কিছু এখানে বসিয়ে দিলেই তা হবে যথার্থ।

সে খুব সহজেই বক্তব্যটিকে বিশ্বাসঘাতক আর চিন্তা-অপরাধীদের নিন্দাবাদ দিয়ে পাল্টে দিতে পারতো কিন্তু তা খুব সাধারণ কিছু হয়ে যাবে। আর কোনও একটি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ের খবর কিংবা নবম ত্রি-বার্ষিক পরিকল্পনার বড় ধরনের কোনও অর্জনের কথা থাকলে তা আরও জটিল করে তুলবে। আসলে যা দরকার সেটি হচ্ছে খাঁটি মজাদার কিছু একটা বসিয়ে দেওয়া। হঠাৎ করেই তার মনের মধ্যে খেলে গেলো এক দারুণ চিন্তা। রেডিমেড, খাটুনি নেই, স্রেফ একটি ছবি বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আর সে ছবিটি হবে নিঃসন্দেহে কমরেড অগিলভির, দিন কয়েক আগে যুদ্ধক্ষেত্রে তার বীরের মৃত্যু হয়েছে। কোনও কোনও দিন বিগ ব্রাদার তার দিনের নির্দেশে দলের কোনও এক অনুগত, উচ্চপদস্থ সদস্যের কথা স্মরণ করেন যার জীবন কিংবা মৃত্যুর ঘটনাকে তিনি অনুসরণীয় বলে তুলে ধরেন। আর ওই দিনটিতে তিনি কমরেড অগিলভিকে স্মরণ করেছেন সেতো হতেই পারে। এটা সত্য কমরেড অগিলভি নামে কেউ কখনো ছিলো না, তবে ছাপার অক্ষরে কয়েকটি লাইন আর মিথ্যা ছবিতে তার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ফুটে উঠবে।

উইনস্টন এক মূহূর্ত চিন্তা করে নিলো, নিজের দিকে স্পিকরাইট যন্ত্রটি টেনে নিয়ে বিগ ব্রাদারের পরিচিত ভঙ্গিমায় উচ্চারণ করতে লাগলো; যে উচ্চারণ একই সঙ্গে সামরিক ও পদধারীর মিশ্রিত রুপ। নিজেই প্রশ্ন করা আবার নিজেই তার উত্তর দেওয়া (তাহলে কমরেডরা এই ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা নিলাম? আমরা শিখলাম- যা আসলে ইংসকের মৌলিক নীতিরও একটি- আর তা হচ্ছে.. ইত্যাদি, ইত্যাদি) যা নকল করা খুব সহজ।

কমরেড অগিলভির বয়স যখন তিন তখন একটি সাব-মেশিনগান, একটি মডেল হেলিকপ্টার আর ড্রাম ছাড়া সব খেলনাই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ছয় বছরে, রীতি শিথীল করে নির্ধারিত বয়সের এক সন আগেই তাকে নেওয়া হয় গুপ্তচরবৃত্তিতে। আর নয় বছরে তাকে একটি গুপ্তচরদলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১১ বছর বয়সে নিজের চাচাকে, কিছু কথাবার্তা শুনে ফেলে অপরাধী প্রবৃত্তির বলে মনে হওয়ায়, থট পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয়। ১৭ বছরে জুনিয়র অ্যান্টি-সেক্স লিগের জেলা সংগঠক হয় অগিলভি। ১৯ বছরে সে একটি হাত গ্রেনেড বানায় যা শান্তি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পায়, আর প্রথম পরীক্ষামূলক ব্যবহারে ওই গ্রেনেডের এক বিষ্ফোরণেই ইউরেশীয়

কারাবন্দিদের একত্রিশ জন নিহত হয়। ২৩ বছরে কর্মরত অবস্থায় তার জীবনাবসান ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সংবাদ নিয়ে ভারত সাগরের ওপর দিয়ে যখন উড়ে যাচ্ছিলেন তখন শত্রুপক্ষের জেট বিমান তার পিছু নেয়, শরীরে মেশিনগানের ওজন বেঁধে হেলিকপ্টার থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো নিয়েই ঝাপিয়ে পড়ে গভীর পানিতে তলিয়ে যান। সঙ্গে ডুবে যায় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের নথিপত্রসহ সব কিছু- আর সেখানেই সব শেষ- বলেন বিগ ব্রাদার। ইর্ষণীয় এক আত্মত্যাগ-বলেন তিনি। সঙ্গে বিগ ব্রাদার আরও কিছু মন্তব্য যোগ করেন যাতে ফুটে ওঠে কমরেড অগিলভির জীবনের খাঁটি ও দৃঢ়তার দিকগুলো। তিনি ছিলেন পুরোপুরি মদ্যপানপরিহারকারী ও অধুমপায়ী ব্যক্তি, দিনে একবার ঘণ্টাখানের ব্যায়ামাগারে কাটানোর বাইরে তার বিনোদন বলতে আর কিছু ছিলো না, কৌমার্যের প্রতি তার ছিলো অগাধ আনুগত্য, বিয়েতে বিশ্বাস আর পরিবারের সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধনে থেকে কাজের প্রতি দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার আত্মনিয়োজন সম্ভব নয়। তার কথাবার্তায় ইংসকের নীতি ব্যতিরীকে আরও কোনও বিষয় থাকতো না, ইউরেশীয় শত্রুদের দমন করা ছাড়া আর তাদের গুপ্তচরদের, বিশ্বাসঘাতকদের, চিন্তা-অপরাধীদের আর যড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করা ছাড়া জীবনের আর কোনও লক্ষ্যও ছিলো না।

কমরেড অগিলভিকে অর্ডার অব কন্সপিশাস মেরিট পদকে ভূষিত করা হবে কি না সে নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজেই বিতর্ক করে নিলো উইনস্টন। আর শেষে না করারই সিদ্ধান্ত নিলো কারণ ওতে খামোখা কিছু বাড়তি তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে।

উল্টোদিকের কুঠুরিতে বসা প্রতিপক্ষের দিকে আরও একবার দৃষ্টি হানলো উইনস্টন। কিছু একটা কারণে তার মনে হচ্ছে- টিলোটসনও একই কাজে ন্যস্ত যা সে নিজেও করছে। কোনও পথই নেই কার কাজটি শেষ পর্যন্ত গৃহীত হবে তা জানা। তবে একটা দৃঢ় আস্থাবোধ তার মধ্যে কাজ করছে যে, তার লেখাটিই নেওয়া হবে। কমরেড অগিলভি, ঘণ্টাখানেক আগে যা কল্পনায়ও ছিলো না, তা এখন এক বাস্তবতা। তার কৌতুহলে আঘাত হানলো আরেক ভাবনা, জীবিত একটি মানুষ সৃষ্টি অসম্ভব হলেও আপনি চাইলে একটি মৃত মানুষ সৃষ্টি করতে পারবেন। কমরেড অগিলভি, যার অস্তিত্বের কোনও বর্তমান কোনও কালে ছিলো না, এখন অতীতে তার অস্তিত্ব আছে। আর যখন এই জাল নথির সব কিছু সবাই ভুলে যাবে, তখন তার অস্তিত্ব এই প্রমাণের ভিত্তিতেই কার্লোস ম্যাগনাস বা জুলিয়াস সিজারের মতোই বাস্তব হয়ে উঠবে।

পঞ্চম অধ্যায়

গভীর পাতালঘরে অনুচ্চ ছাদের ক্যান্টিনে দুপুরের খাবার নেওয়ার লম্বা লাইনটি শম্বুকগতিতে এগুচ্ছে। ঘরটিতে মানুষ গিজগিজ

করছে, শোরগোলে কান ঝালাপালা। কাউন্টারের লোহার বেড়ার ওপার থেকে ধাতব লবনের গন্ধমাখা স্ট্যুর ধোঁয়া এসে নাকে লাগছে, আর তা ছাপিয়ে ভিক্টরি জিনের কড়া গন্ধ। কামরার শেষের দিকে ছোট্ট বার সেখান থেকে দেয়ালের ছোট গলুই গলিয়ে আসছে জিন, ১০ সেন্টে মিলে যাবে বড় এক ঢোক।

‘ঠিক যাকে খুঁজছিলাম,’ পেছন থেকে কেউ একজনের গলা শুনতে পেলো উইনস্টন।

ঘুরে দেখে বন্ধু সাইম। গবেষণা বিভাগে কাজ করে। ‘বন্ধু’ শব্দটি সম্ভবত সঠিক নয়। আজকাল বন্ধু বলে কেউ নেই, সবাই কমরেড। তবে কিছু কমরেড আছেন যারা অন্যদের চেয়ে একটু ঘনিষ্ঠ। সাইম ভাষাতত্ত্ববিদ। নিউস্পিক বিশেষজ্ঞ। নিউস্পিক অভিধানের ১১তম সংস্করণ তৈরিতে যে বড় একটা কর্মীবাহিনী কাজ করছে তাদের একজন। ছোটখাটো গড়ন, উইনস্টনের চেয়েও ছোট। কালো লম্বাটে চুল, প্রস্ফীত চোখে মেখে থাকে শোকগ্রস্ত, ভীত চাহুনি। আপনি যখন ওর সঙ্গে কথা বলবেন, মনে হবে ও আপনার মুখমণ্ডলে কিছু একটা খুঁজছে।

‘তুমি রেজর ব্লেড পেয়েছো নাকি?,’ প্রশ্ন সাইমের।

‘নারে.. একটাও না, অপরাধীর গলা উইনস্টনের। বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করেছি। মনে হয় আর পাওয়া যাবে না।’

সবাই কেবল রেজর ব্লেডের কথাই জানতে চায়। তার কাছে অবশ্য দুটো ছিলো, অব্যহৃত। আগেই তুলে রেখেছিলো। মাস কয়েক আগে যখন রেজর ব্লেডের মঙ্গা দেখা দিলো তখন। যে কোনও সময়ই বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহে পার্টির দোকানগুলো অপারগতা ঘোষণা করে দেয়। কখনো বোতাম, কখনো রিফুর উল, কখনো জুতোর ফিতে। এখন রেজর ব্লেড। পেতে পারেন, অতি সংগোপনে, ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে যদি ‘ফ্রি’ মার্কেটগুলোতে আপনি টুক করে ঢুকে পড়তে পারেন তাহলে। তবে তাতেও যে মিলেই যাবে তার নিশ্চয়তা নেই।

‘আমি ছয় সপ্তাহ ধরে একই ব্লেড ব্যবহার করছি,’ মিথ্যা করেই বললো উইনস্টন।

খাবারের জন্য লাইনটি আরেক ধাক্কা এগিয়ে ফের থমকালো। উইনস্টন ঘুরলো সাইমের দিকে। কাউন্টারের শেষ মাথা থেকে তেলতেলে দুটো ধাতব ট্রে তুলে নিলো দুজন।

‘গতকাল কারাবন্দিদের ফাঁসি দেখতে গিয়েছিলে নাকি?’ প্রশ্ন সাইমের।

‘কাজ ছিলো’ উত্তর উইনস্টনের। ‘ভিডিওচিত্রে দেখে নিতে পারবো, আশা করি।’
‘বিকল্প হিসেবে এটাকে ভালো কিছু বলবো না’ গম্ভীর কণ্ঠ সাইমের।

উইনস্টনের মুখের ওপর ঘুরছে তার বিদ্রুপাত্মক চাহুনি। ‘আমি তোমাকে চিনি,’ চোখ জোড়া যেনো সে কথাই বলতে চাইছে। ‘আমি তোমার ভেতরটা দেখতে পাই, আমি জানি কেনো তুমি কারাবন্দিদের ফাঁসি দেখতে যাওনি।’ বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে সাইম বিষাক্ত গোঁড়া কিসিমের। শত্রুপক্ষের গ্রামে যখন হেলিকপ্টার হামলা চালায়, চিন্তা- অপরাধীরা যখন স্বীকারোক্তি দেয় কিংবা বিচারের মুখোমুখি দাঁড়ায়, ভালোবাসা মন্ত্রণালয়ের কারাবন্দিদের যখন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় আর সেসব নিয়ে ও যখন কথা বলে তখন কণ্ঠে সন্তুষ্টি ঝড়ে ঝড়ে পড়ে অবিশ্বাস্য সংকীর্ণতায়। ওর সঙ্গে কথা বলার সময় এসব বিষয় এড়িয়ে বরং সম্ভব হলে নিউস্পিকের খুঁটিনাটি দিকগুলো টেনে আনা ভালো। ওতে তার দখল যেমন আছে, মজাও পাওয়া যায়। বড় কালো দুটি চোখের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এড়াতে উইনস্টন মাথাটি ইষৎ ঘুরিয়ে নিলো।

‘দারুণ ফাঁসি হয়েছে’- শুনিয়ে দিতে চাওয়ার ভঙ্গিমা সাইমের কণ্ঠে। ‘অবশ্য ওদের প্রত্যেক দুই পা এক সাথে বেঁধে ঝোলানোর বিষয়টি ফালতু মনে হয়েছে। মৃত্যুযন্ত্রণায় ওরা পা গুলো ছোঁড়াছুড়ি করছে এমনটা দেখতেই ভালো লাগতো। তবে দারুণ লেগেছে যখন ওদের জিহ্বাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে এলো আর কড়া নীল হয়ে গেলো সেই দৃশ্যটা দেখতে। এই বিষয়টি আমার মধ্যে একটা আবেদন তৈরি করে।’

‘নেক্স’ প্লিজ! হাতা হাতে চিৎকার পাড়লো সাদা অ্যাপ্রোন পরা প্রোলদের একজন।

উইনস্টন ও সাইম গ্রিলের নীচ দিয়ে দুজনের ট্রে দু’টি ঠেলে দিলো। তাতে দ্রুতই ভরে দেওয়া হলো দুপুরের বরাদ্দ খাবার- ছোট ধাতব পেয়ালায় ধূসর-গোলাপি স্ট্যু, এক খামচা রুটি, এক টুকরো পনির, দুধহীন এক মগ ভিক্টরি কফি আর একটি স্যাকারিন ট্যাবলেট।

‘চলো টেলিস্ক্রিনের নিচে একটি টেবিল ফাঁকা আছে,’ বললো সাইম। ‘যাওয়ার পথে জিন নিয়ে নেই।’

হাতলবিহীন চীনা পাত্রে ওদের জিন এলো। ভিড় ঠেলে গিয়ে খাবার নিয়ে বসলো ধাতব পাতের পাটাতনের টেবিলে, যার এক কোনায় কারো ফেলে যাওয়া থকথকে স্ট্যু পড়ে আছে, দেখে মনে হবে কেউ বমি করে রেখেছে। জিনের পাত্রটাই প্রথম তুলে নিলো উইনস্টন। একটু দম টেনে শরীরটাকে শক্ত করে নিলো, আর তেল-স্বাদের তরলটুকু ঢেলে দিলে গলদেশের গভীরে।

চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসা পানি মুছতে মুছতে তার মনে হলো ভীষণ ক্ষুধার্ত সে। চামচ ডুবিয়ে স্ট্যু তুলে গলায় ঢালতে লাগলো। তরল স্যুপের মধ্যে গোলাপী মতো দেখতে যে ছোট ছোট পিচ্ছিল টুকরোগুলো দেখা যাচ্ছে ওগুলো মাংসে তৈরি। স্ট্যুর পেয়ালা পুরোটা শেষ করার আগে দু‘জনের মুখে রা’ শব্দটিও উচ্চারিত হলো না। উইনস্টনের বায়ে একটু পেছনের দিকের একটি টেবিলে একজন টানা বকবক করে যাচ্ছিলো। হাঁসের প্যাক-প্যাক শব্দের মতে ছিলো সে উচ্চারণ। গোটা কক্ষে যে হৈচৈ চলছে তা ছাপিয়েও কানে লাগছিলো সে শব্দ।

‘অভিধানের কাজ কেমন এগুচ্ছে? শোরগোলের মাঝে একটু উঁচুকণ্ঠেই জিজ্ঞেস করলো উইনস্টন।

‘ধীরে ধীরে,’ বললো সাইম। ‘বিশেষণ নিয়ে কাজ করছি, ভালোই লাগছে।’

নিউস্পিকের প্রসঙ্গে খুব দ্রুতই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর মুখ। স্ট্যুর পেয়ালাটা একদিকে ঠেলে রেখে এক হাতে রুটি আর হাতে পনিরের টুকরোটি তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর অনেকখানি ঝুঁকে গেলো যাতে না চিল্লিয়ে কথা বলা যায়।

‘একাদশ সংস্করণটিই চূড়ান্ত’ বললো সে। ‘আমরা ভাষাটির একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাচ্ছি- এমন একটা রূপ যে এর বাইরে মানুষের কথ্য আর কিছু থাকবে না। আমরা কাজ শেষ করলে তোমাদের মতো লোকেদের এর গোটাটাই ভালো করে শিখতে হবে। সবাই জানে, আমাদের প্রধান কাজ নতুন নতুন শব্দ তৈরি। কিন্তু আসলে যা হচ্ছে, আমরা প্রতিদিন শব্দ ধ্বংস করছি- ঝাঁকে-ঝাঁকে শব্দ, শত শত শব্দ। আমরা ভাষাটির হাড্ডি ছেঁটে ছোট করে দিচ্ছি। আমি বলতে চাই, এগারোতম সংস্করণে এমন একটি শব্দও থাকবে না যা ২০৫০ সালের আগে বিলীন বা অকেজো হবে।

ক্ষুধার্তের মতো বড় গ্রাসে রুটিতে কামড় বসালো, আর গিললো সাইম। আর কথা চলতে থাকলো পণ্ডিতি ধাচে। চিমসানো কালো চেহারাটা যেনো অঙ্কিত ছবির রূপ নিলো আর চোখের সেই সারাক্ষণের খুঁজে বেড়ানোর ভাবটা কেটে স্বপ্নময় হয়ে উঠলো। ‘শব্দ ধ্বংস অসাধারণ একটা কাজ! ক্রিয়া আর বিশেষণগুলোর বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এটা ঠিক, কিন্তু শত শত বিশেষ্য থেকে মুক্তি মিলছে। সমার্থক শব্দগুলোই কেবল নয়, বাদ যাচ্ছে বিপরীতার্থকগুলোও। অন্য একটা শব্দের বিপরীত, এইতো, এর এমনকি প্রয়োজন বলো। প্রতিটি শব্দই তার বিপরীতার্থ ধারন করে। যেমন ধরো “গুড”, এর জন্য “ব্যাড” শব্দের প্রয়োজন কি? “আনগুড” য়েই চলে যায়। আর কেবল চলবেই কেনো, আমি বলি এটাই অপেক্ষাকৃত সঠিক, কারণ এতে বৈপরীত্বটা স্পষ্ট হয় যা “ব্যাড” শব্দে হয় না। আবার তুমি যদি “গুড”র আরও শক্ত কোনও ব্যঞ্জনা চাও, তখন “এক্সিলেন্ট”, “স্প্লেন্ডিড” এমন আরও কিছু ফালতু শব্দের প্রয়োজন

দেখি না। বলে দাও “প্লাসগুড” ওতেই অর্থ পরিষ্কার অথবা যদি কিনা আরও জোর দিয়ে ভালোত্বের প্রকাশ ঘটাতে চাও “ডাবলপ্লাসগুড” বলো। এরই মধ্যে আমরা এগুলোর ব্যবহার শুরু করেছি, তবে নিউস্পিকের যে চূড়ান্ত সংস্করণ হচ্ছে এর বাইরে আর কিছুই থাকবে না। আর শেষমেষ ভালোত্ব আর মন্দত্বের সকল ধারনাই মাত্র ছয়টি শব্দের মাঝে সন্নিবেশিত হবে- প্রকৃতপক্ষে একটি শব্দে। ভাষার এই সৌন্দর্যটা তোমার চোখে পড়ছে না, উইনস্টন? আর অতি অবশ্যই, প্রধানত এটা বি.বি.’র অভিপ্রায়,’ যেন অনুগতচিন্তার অনিবার্য প্রকাশের অংশ হিসেবেই যোগ করলো সে।

বিগ ব্রাদারের নাম উঠতেই চেহারায় মেকি একটা আগ্রহের ছাপ মেখে নিলো উইনস্টন। হলে কি হবে, সাইম দ্রুতই ধরে ফেললো তার মধ্যে উচ্ছ্বাসের খামতি আছে।

‘নিউস্পিক নিয়ে তোমার ভিতরে কোনও আগ্রহ দেখি না, উইনস্টন,’ করুণ ব্যাথিত সুরে বললো সে। ‘এমনকি যখন লেখো তখনও তোমার মধ্যে পুরোনো ভাষাই ভর করে থাকে। “দ্য টাইমসে” তোমার কিছু কিছু লেখা মাঝে মধ্যে পড়ি। ভালোই লেখো কিন্তু ওগুলো স্রেফ অনুবাদ ছাড়া আর কিছু হয় না। তোমার হৃদয়ের গহীনে পুরোনো ভাষারীতির সব ফালতু আর অপ্রয়োজনীয় অর্থগুলো ধরে রাখার ইচ্ছাটাই প্রবল দেখি। তুমি কি জানো এই নিউস্পিক হতে যাচ্ছে বিশ্বের একমাত্র ভাষা যার শব্দভাণ্ডার হরবছর হ্রাস পাচ্ছে।

উইনস্টন বিষয়টি ভালোই জানে। সে হাসলো, অনুকম্পার হাসি, তবে মনে হলো না তার কথা বলার দরকার আছে। সাইম কালচে রুটিতে আরো একটা কামড় বসালো, কিছুটা চিবিয়ে নিয়ে ফের শুরু করলো:

‘তুমি দেখছো না, নিউস্পিকের লক্ষই হচ্ছে চিন্তার পরিধিটি ছোট করে আনা। আর এর মধ্য দিয়ে শেষমেষ আমরা চিন্তা অপরাধ সংঘটন আক্ষরিক অর্থে অসম্ভব করে তুলবো। কারণ, বস্তুত তখন বিষয়টি প্রকাশের জন্য কোনও শব্দই থাকবে না। প্রয়োজন হতে পারে এমন প্রতিটি ধারনাই একটি মাত্র শব্দে ব্যক্ত হবে যার অর্থও কঠোরভাবে সংজ্ঞায়িত থাকবে আর এর সম্পূরক অর্থগুলো মুছে ফেলা হবে, ভুলে যাওয়া হবে। ‘হবে নয়’, বলতে পারো ‘হয়ে গেছে’। একাদশ সংস্করণে আমরা এর থেকে আর খুব দূরে নই। তবে প্রক্রিয়া চলবে আরও দীর্ঘ সময় ধরে, তোমার আমার মৃত্যুরও অনেক পরে পর্যন্ত। এটা স্রেফ আত্ম-শৃঙ্খলাবদ্ধতার প্রশ্ন, বাস্তবতা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। তবে শেষ পর্যন্ত এর আদৌ কোনও প্রয়োজনও আর হবে না। ভাষা সঠিক হয়ে উঠলেই বিপ্লব সুসম্পন্ন হবে। নিউস্পিকই ইংসক আর ইংসকই নিউস্পিক,’ এক ধরনের রহস্যাবৃত্ত সন্তুষ্টির উচ্চারণে কথাগুলো বলে গেলো সে। ‘তুমি কি

কখনো ভেবে দেখেছো, উইনস্টন, ২০৫০ সালের পর একটি মানুষও জীবিত থাকবে না যে আজ তুমি আমি যেই ভাষায় কথা বলছি তা বুঝতেও পারবে।’

‘কেবল মাত্র…’ সন্দেহমাখা কণ্ঠে কথাটা বলতে শুরু করেই থেমে গেলো উইনস্টন।

তার ঠোঁটের আগায় যে কথাটি এসে জমেছিলো তা হচ্ছে ‘কেবলমাত্র প্রোলরা ছাড়া,’ কিন্তু সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলো, এই ভেবে তার এই মন্তব্য নিশ্চিতভাবেই প্রথাসিদ্ধ হবে না। তবে সে ঠিক কি বলতে যাচ্ছিলো তা দিব্য আর ধী-শক্তিতে ঠিক বুঝে নিলো সাইম।

‘প্রোলরা মনুষ্য জাত নয়’ অবজ্ঞামাখা উচ্চারণ তার। ‘২০৫০ সালের মধ্যে- হতে পারে তার আগেই, এই পুরোনো ভাষার সকল বাস্তব জ্ঞানের সমাপ্তি ঘটবে। পুরোনো সময়ের সকল সাহিত্য ধ্বংস করে দেওয়া হবে। চসার, শেক্সপিয়র, মিল্টন, বায়রন- এরা সবাই নিউস্পিক ভার্সনে টিকে থাকবেন, তবে তা কেবল ভিন্ন কিছুতে পরিবর্তীত হয়ে নয়, বরং বিতর্কিত কিছু বিষয়ের মধ্য দিয়ে, যাতে তারা অভ্যস্তও। এমনকি পার্টির সাহিত্য-কর্মও পাল্টে যাবে, স্লোগান পাল্টে যাবে। “স্বাধীনতা দাসত্ব” এমন একটি স্লোগান তুমি কিভাবে ধরে রাখবে যখন স্বাধীনতার ধারনাটিই আর থাকবে না? চিন্তুার পুরো আবহটিই পাল্টে যাবে। বস্তুত, যতটুকু বুঝতে পারি, চিন্তা বলেই আর কিছু থাকবে না। প্রথা মানেই চিন্তাহীনতা- চিন্তার অপ্রয়োজনীয়তা। প্রথা মানেই অসচেতনতা।’

হঠাৎই গভীর নিশ্চয়তায় উইনস্টনের মনে হলো, এই সময়েরই কোনও এক দিন সাইমকে বাষ্পায়িত করা হবে। সে অত্যন্ত ধী-শক্তি সম্পন্ন। সে সবকিছুই একটু বেশিই আগে দেখে ফেলছে, সোজাসাপ্টা তা বলেও দিচ্ছে। পার্টি এ ধরনের মানুষ খুব একটা পছন্দ করে না। একদিন সে গুম হয়ে যাবে। তার চোখে মুখে সেটাই লেখা রয়েছে।

রুটি আর পনির গেলা শেষ করলো উইনস্টন। চেয়ারে একদিকে একটু বেঁকে গিয়ে কফির মগে চুমুক দিলো। বামদিকে পেছনের টেবিলের লোকটি তখনও কর্কশ স্বরে তার অবিরাম অবিন্যস্ত কথা চালিয়ে যাচ্ছেন। এক তরুণী, হতে পারে তার সেক্রেটারি, উইনস্টনের সঙ্গে পীঠাপীঠি করে বসা, ভদ্রলোকের সব কথায় আগ্রহভরে অবিরাম সায় দিয়ে চলেছে। রিনরিনে নারী কণ্ঠের সে উচ্চারণের দু’একটা উইনস্টনের কর্ণকুহরে পশেছে- ‘আমি মনে করি আপনিই ঠিক, আমি আপনার সাথে একমত’ ধরনের বাক্য। আর উল্টোদিকের বক্তা বকে যাচ্ছেন অবিরাম। মেয়েটি যখন কিছু বলছে তখনও থামছেন না। চোখের দেখায় লোকটিকে চেনে উইনস্টন, ফিকশন বিভাগে কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন, এটুকুর বাইরে কিছুই জানা নেই তার। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, মোটা গ্রীবা, বড় হা।

মাথাটি ইষৎ হেলিয়ে রাখায় তার চশমা জোড়ায় যে আলো পড়েছে তাতে উইনস্টনের চোখে তার চোখ নয়, ধরা পড়ে আছে দুটো ব্ল্যাঙ্ক ডিস্ক। তবে কিছুটা ভয়ের বিষয় হচ্ছে, তার মুখ থেকে যে কথার ফল্গুধারা ছুটছিলো তার মধ্য থেকে একটি শব্দও আলাদা করে বুঝতে পারা ছিলো প্রায় অসম্ভব। মাত্র একটি বারের মতো উইনস্টন ধরে ফেলেছিলো তার কথা- ‘গোল্ডেস্টেইনীয় তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত অবসান’- আর সে কথা দ্রুতই আবার হারিয়ে গেলো অন্যান্য অবোধ্য উচ্চারণে। অন্যদের জন্য এই বকবকানি শোরগোল বা হাঁসের মতোই প্যাঁকপ্যাঁক বই আর কিছুই নয়। আর আপনি যখন শুনতেই পাবেন না লোকটি কি বলছে তখন সেই কথা নিয়ে আপনার মনে সন্দেহও দানা বাঁধবে না। হতে পারে সে গোল্ডস্টেইনের চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছে, আর চিন্তা অপরাধী ও নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোরতর শাস্তির দাবি তুলছে, হতে পারে সে ইউরেশীয় সেনাদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে ফোঁসফাঁস করছে, নতুবা হতে পারে সে বিগ ব্রাদারের কিংবা মালাবার যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের প্রশংসা করছে- এর কোনও কিছুতেই কিছু আসে যায় না। যাই থাক-না থাক এই বকবকানিতে, মূল সূর একটাই তা হচ্ছে- খাঁটি গোঁড়ামি আর খাঁটি ইংসক। একটি চোখহীন মুখমণ্ডলের চোয়ালটি যখন অবিরত উপর-নিচ করে যাচ্ছিলো, তা দেখে উইনস্টনের মধ্যে একটি কৌতুহলের অনুভূতি কাজ করলো, তার মনে হলো লোকটি আসলে রক্ত-মাংসের মানুষ তো! নাকি স্রেফ একটা কুশপুতুল! লোকটির মস্তিষ্ক থেকে এই কথা বেরিয়ে আসছে না, আসছে তার বাগযন্ত্র থেকে। তার ভেতর থেকে যা কিছু বেরিয়ে আসছে তা বাস্তবিক অর্থে কোনও কথা নয়, কেবলই শব্দের সমাহার; অসচেতনতায় উচ্চারিত হৈচৈ ধ্বনি, ঠিক যেনো হাঁসের প্যাঁকপ্যাঁক।

এক মুহূর্তের জন্য থামলো সাইম, চামচের হাতল ধরে স্ট্যুর মধ্যে নাড়ানাড়ি করছে অবিরাম। অন্য টেবিল থেকে প্যাঁকপ্যাকানি চলছেই, যা চারিদিকের শোরগোলের মধ্যেও সহজেই কানে এসে বাড়ি মারছে।

‘নিউস্পিকে একটা শব্দ আছে,’ বললো সাইম, ‘তুমি জানো কিনা জানিনা, ডাকস্পিক, মানে হাঁসের মতো প্যাঁক-প্যাঁকানো। এটি সেইসব মজার শব্দের একটি যা একই সঙ্গে দুটি পরস্পর বিরোধী অর্থ দেয়। তুমি তোমার প্রতিপক্ষের কারো সম্পর্কে কথাটি বললে তাকে হেয় করা হবে আর যদি তুমি তুষ্ট এমন কারো প্রসঙ্গে বলো, তাহলে সেটা হবে প্রশংসা।’

প্রশ্নাতীতভাবেই সাইমকে বাষ্পায়িত করে দেওয়া হচ্ছে, আরও একবার ভাবলো উইনস্টন। তার এই ভাবনার মধ্যে একধরনের দুঃখবোধও কাজ করছিলো। যদিও সে ভালো করেই জানতো সাইম তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, কিছুটা অপছন্দ করে আর যদি একটি বারও তার কাছে মনে হয় সে চিন্তা অপরাধী তাহলে তাকে ফাঁসিয়ে দিতে এতটুকু পিছপা হবে না। বোকার মতো কিছু একটা ভুল সাইম করে ফেলেছে। কিছু একটা অভাব ওর মধ্যে দেখা

যাচ্ছে: অসাবধানতা, উদাসীনতা, বা নির্বোধের মতো কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলেছে। ওকে তো ব্যত্যয়কারীদের কেউ একজন বলা যাবে না। ইংসকের নীতিতে বিশ্বাসী, বিগ ব্রাদারের প্রতি বিশ্বস্ত, যে কোনো জয়ে আনন্দের সীমা থাকে না, উৎপথগামীদের ঘৃণা করে, আর তা যে কেবল অত্যন্ত আন্তরিকতায় করে তাই নয়, সীমাহীন উদ্দীপনার সাথেই করে। পার্টির সব তাজা খবরই সে রাখে, যেসব খবর অন্য অনেক সদস্য গায়ে মাখে না তা নিয়েও সে থাকে সমান উদ্দীপ্ত। তারপরেও মৃদু একটা অশোভনতা ওকে যেনো ঘিরে থাকে। ও এমন কিছু বলে, যা না বললেই বরং ভালো হতো, অনেক বই পড়ে, চিত্রকর আর গায়কদের দেখতে চেস্টনাট ট্রি ক্যাফেতেও তার নিয়মিত গতায়ত। চেস্টনাট ট্রি ক্যাফেতে যাওয়া যাবে না এমন কোনও আইন নেই। নেই কোনও অলিখিত বিধান। তারপরেও স্থানটিকে কেন জানি অশুভ বলেই জ্ঞান করা হয়। দলের পুরোনো, অসম্মানিত নেতারা শেষ ধোলাই হওয়ার আগে এখানেই আড্ডা জমাতো। বলা হয়, দশক কয়েক আগে গোল্ডস্টেইনকেও বার কয়েক ওখানে দেখা গেছে। এই থেকে সাইমের কপাললিখন পড়ে ফেলা খুব কঠিন কিছু নয়। একথা ধ্রুব সত্য, সাইম যদি তিন সেকেন্ডের তরেও উইনস্টনের গোপন এই ধারনার কথা জানতে পারে, তার বিরুদ্ধে থট পুলিশকে নালিশ করে দিতে সে একদণ্ড সময়ও নেবে না। অন্য যে কেউই তাই করবে: কিন্তু সাইম এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে। উদ্দীপনা দেখালেই তা যথেষ্ট নয়। গোঁড়ামি অবচেতনতারই নামান্তর।

মাথা তুললো সাইম। ‘এই ঢুকলো পারসন্স,’ বললো সে।

গলার স্বরে এমন একটা ভঙ্গি ছিলো যেনো সে বলতে চেয়েছিলো, ‘ফালতু নির্বোধটা এলো’। ভিক্টরি ম্যানসন্সে উইনস্টনের প্রতিবেশী পারসন্স, ততক্ষণে রুমের ওপ্রান্তে যাওয়ার যুদ্ধে রত। মাঝারি উচ্চতার মোটাসোটা লোকটার মাথায় সাদা চুল, ব্যাঙমুখো চেহারা। পয়ত্রিশেই তার ঘাড়ে-গর্দানে আর ভুরিতে দলা দলা চর্বি জমেছে। তবে তার হাঁটাচলায় একটা বালকসুলভ ভঙ্গিমা আছে। তার পুরো অবয়বে মনে হয়, ছোট একটা বালক, গায়ে-গতরে একটু বেশি বেড়ে গেছে। নীতি মেনে কাপড় পরেও এই ভাব সে কাটাতে পারে না। স্পাইজের নীল শর্টস, ধূসর শার্ট আর লাল গলবন্ধ ছাড়া পারসন্সকে দেখা যাবে, এমনটা ভাবাও অসম্ভব। তাকে চোখে পড়া মাত্রই দেখা যাবে তার শর্টসের হাঁটুর অংশ আর শার্টের আস্তিন কুঁচকে উপরে উঠে হাত ও পায়ের থলথলে চর্বি তুলে ধরছে। তবে দলের যখন কোনো কর্মসূচি থাকে তখন এই পোশাক ছেড়ে অন্যকিছু পরতেও পারসন্সকে দেখা যায়। ‘হালো, হালো!’ বলে দুজনকেই শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের টেবিলেই বসে পড়লো। আর সাথে সাথে নাকে এসে লাগলো ঘামের গাঢ় গন্ধ। গোলাপি মুখমণ্ডলটা ভেজা ভেজা। তার ঘামের গন্ধের শক্তি অনন্যসাধারণ। কমিউনিটি সেন্টারে যে কেউ টেবিল টেনিস ব্যাটের হাতল ধরে বলে দিতে পারবে পারসন্স খেলে গেছে। সাইম এক পাতা কাগজ তুলে তার মধ্যে লেখা দীর্ঘ একটি

কলাম গভীর মনোযোগে পড়তে শুরু করলো। হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে একটি কালির কলম চেপে ধরে সেটি টেনে টেনে পড়ছিলো।

‘দ্যাখো ব্যাটাকে, লাঞ্চের সময়েও কাজ করছে,’ উইনস্টনের গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো পারসন্স। ‘কি মনোযোগ, আহা! ওর মধ্যে তুমি এমন কি পাচ্ছো, বুড়ো বালক? আশা করবো, আমার জন্য জ্ঞানের কিছু একটা হবে। স্মিথ, বুড়ো বালক, আরে শোনো, তোমাকেই খুঁজছি। আমাকে চাঁদা দেওয়ার কথা ভুলে গেছো বুঝি!’

‘কিসের চাঁদা?’, টাকার ওপর দরদ থেকেই বললো উইনস্টন। প্রত্যেকের বেতনের চারভাগের একভাগই এই স্বেচ্ছাসেবীদের চাঁদার খাতে চলে যায়। আর এরা সংখ্যায় এত বেশি যে আপনি চাইলেও ওদের হিসাব কষে রাখতে পারবেন না।

‘ঘৃণা সপ্তাহের জন্য- তুমি জানো- ঘরে ঘরে আদায় হচ্ছে এই তহবিল। আমাদের ব্লকে আমিই কোষাধ্যক্ষ। উঠেপড়ে লেগেছি- একটা দারুণ কিছু দেখাতে চাই। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, ভিক্টরি ম্যানসন্সের বাইরের ফ্ল্যাগগুলো হবে গোটা সড়কের মধ্যে সবচেয়ে বড়, টাকার অভাবে না পারলে পরে আমাকে দুষবে না, বলে দিচ্ছি। দুই ডলার দেবে বলে কথা দিয়েছিলো তুমি।’

পকেট হাতড়ে কোচকানো, নোংরা দুটি নোট বের করে এগিয়ে দিলো উইনস্টন। পারসন্স ওদুটো ছোট নোটবুকের পাতার ভাজে ঢুকিয়ে দিয়ে তাতে অশিক্ষিত সাবধানি হস্তাক্ষরে টুকে রাখলো।

‘ওহ শোনো, বুড়ো বালক,’ বললো সে। ‘শুনলাম আমার ছোট পাঁজিটা তোমার গায়ে গতকাল গুলতি ছুঁড়েছে। ব্যাটাকে কঠিন করে বকে দিয়েছি। আর বলেছি ফের যদি এমনটি করে আমি ওর গুলতিটাই কেড়ে নেবো।’

‘ফাঁসি দেখতে যেতে না পেরে ও মনে হয় একটু বিচলিত ছিলো,’ বললো উইনস্টন।

‘সেটা ভালো- আসলে আমি বলতে চাইছি এমটাইতো হওয়ার কথা, কি বলো? দুটোই পাঁজি ছোট বেয়াদব, কিন্তু ওদের অনুরাগের কথা ভাবো! ওদের চিন্তা জুড়েই আছে স্পাইজ, যুদ্ধ- এগুলো। তুমি কি জানো, গত শনিবার বার্কহ্যামেস্টেডে প্রচার অভিযানের সময় আমার ওই ছোট্ট মেয়েটি কি করেছে? আরও দুটি মেয়ে জুটিয়ে নিয়ে কর্মসূচি থেকে আস্তে করে সটকে পড়ে, আর গোটা বিকেল ওরা এক আগন্তুকের পিছু নিতে থাকে। টানা দুই ঘণ্টা লেজে লেজে কাটিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যখন আমার্শ্যামে পৌঁছায় তখন টহলদারদের হাতে ব্যাটাকে ধরিয়ে দেয়।’

‘ওরা কি জন্য এটা করলো?’ একটু উদ্বেগের স্বরেই বললো উইনস্টন। আর পারসন্স তার খুশির গদগদ ভাবটা ধরে রেখেই বলে চললো: ‘মেয়ে আমার বুঝে ফেলেছিলো লোকটি শক্রপক্ষের চর- ধরে নাও প্যারাসুটে চেপে এসেই নেমেছে। কিন্তু এখানেই কথা, হে বুড়ো বালক। কি বলোতো- মেয়েটিকে নিশ্চয়ই তোমায় সবার সেরা বলতে হবে। সে কি করছে, লক্ষ করেছে ব্যাটার জুতোয়। এক অদ্ভুদ ধরনের জুতো পরেছিলো সে- বললো এমন জুতো আর কাউকে কখনোই পরতে দেখেনি। সুতরাং ধরেই নেওয়া যায় সে বিদেশি। সাত বছরের এক দুধের শিশুর জন্য ভীষণ স্মার্ট একটা কাজ, কি বলো?’

‘লোকটির কি হলো?’ প্রশ্ন উইনস্টনের।

‘আরে, সেটা জানি না। তবে এ কথা শুনলে মোটেই বিস্মিত হবো না যদি… পারসন্স বন্দুক তাক করার একটি ভঙ্গি করলো আর মুখে ‘ফটাস’ শব্দ করলো।

‘দারুণ,’ অন্যমনষ্ক ভঙ্গিমাতেই উচ্চারণ সাইমের, তবে তার সেই কাগজের লেখা থেকে চোখ তুললো না।

‘অবশ্যই কোনো সুযোগ দেওয়ারই সুযোগ নেই আমাদের’ দায়িত্বের অংশ হিসেবে সম্মতি জ্ঞাপন করলো উইনস্টন।

‘আসলে আমিও তাই বলতে চাই, ঠিক যখন একটি যুদ্ধ চলছে,’ বললো পারসন্স।

যেনো সে কথারই নিশ্চয়তা দিতে ঠিক তখনই ওদের মাথার ওপর বসানো টেলিস্ক্রিনে বেজে উঠলো তুর্যনাদ। সেটা অবশ্য কোনো সামরিক য্দ্ধু জয়ের ঘোষণা দিতে নয়, স্রেফ প্রাচুর্য মন্ত্রণালয়ের একটি এলান তুলে ধরতে।

‘কমরেডস!’ একটা উত্তেজিত যৌবনদ্দীপ্ত কণ্ঠ বেজে উঠলো। ‘অ্যাটেনশন, কমরেডস! তোমাদের জন্য আমাদের কাছে দারুণ খবর আছে। আমরা উৎপাদন যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। উৎপাদিত সকল ভোগ্যপণ্যের অবিক্রিত অংশের হিসাব বলছে মানুষের জীবনমান যা বেড়েছে তা গেলো বছরের তুলনায় ২০ শতাংশের কম হবে না। গোটা ওশেনিয়া জুড়ে আজ সকালে ফ্যাক্টরি শ্রমিক আর অফিস কর্মীরা মিছিল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে, তাদের হাতে ব্যানার, মুখে স্লোগান। তাতে বিগ ব্রাদারের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতারই প্রকাশ। তারা বলেছে, বিগ ব্রাদারের বুদ্ধিমত্তার নেতৃত্বই তাদের নতুন সুখী জীবন এনে দিয়েছে। এখানে কতগুলো পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। খাদ্য সামগ্রী….।’

‘আমাদের নতুন সুখী জীবন’ কথাটি কয়েকবার করে বাজলো। প্রাচুর্য মন্ত্রণালয়ের ঘোষণায় এর ব্যবহার খুব শোনা যায়। সেই যে

তুর্যধ্বনি পারসন্সনের মনোযোগ কেড়ে নিলো, এরপর গভীর নিরবতায়, গাম্ভীর্য নিয়ে পুরো ঘোষণাটি শুনলো। পরিসংখ্যানগুলো তার ধরতে পারার কথা নয়; কিন্তু এটা বুঝেছিলো ওগুলো সন্তোষজনক কিছু হবে। বড় সাইজের নোংরা একটি পাইপ বের করে আনলো সে, যার আধাটা পোড়া তামাকে ভরা। যখন তামাকের রেশন সপ্তায় ১০০ গ্রাম, তখন গোটা পাইপ পুরে তামাক টানা কারো পক্ষে কদাচই সম্ভব। অতি সাবধানে আড়াআড়ি করে ধরে রেখে একটি ভিক্টরি সিগারেট ফুঁকছিলো উইনস্টন। আগামীকালের আগে নতুন রেশন মিলছে না, আর তার কাছে মাত্র চারটি সিগারেট মজুদ আছে। বাইরের শোরগোল বাঁচিয়ে টেলিস্ক্রিনের কথাগুলোই শোনার চেষ্টা করছিলো উইনস্টন। বলা হচ্ছে- চকোলেটের রেশন বাড়িয়ে সপ্তাহে ২০ গ্রাম করায় কোথায় যেনো বিগ্র ব্রাদারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মিছিল হয়েছে। মাত্র গতকালই সে চকোলেটের রেশন সপ্তাহে ২০ গ্রামে নামিয়ে আনার পূর্ব ঘোষণাটি ঘঁসে ঠিক করে রেখেছিলো। এও কি সম্ভব মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মানুষ এই নতুন কথা মেনে নেবে! কিন্তু হ্যাঁ, তারা তো মেনেই নিয়েছে। যেমন পারসন্স খুব সহজেই মেনে নিয়েছে, নির্বোধ পশুর মতোই মেনে নিয়েছে। অন্য টেবিলের চক্ষুহীন জন্তুটিও আরও অতিমাত্রার গোঁড়ামি আর গদগদ ভাব নিয়েই মেনে নিয়েছে। আর কেবল মেনেই নেয়নি, গেলো সপ্তাহেও চকোলেটের রেশন ত্রিশ গ্রাম ছিলো এমন কথা যারা ঘুণাক্ষরে মনে আনবে তাদের খুঁজে বের করে নিন্দাবাদ জানিয়ে, বাস্পায়িত করে দেওয়ার উগ্র মনোভাবও পোষণ করছে। সাইম, সেও- তবে আরেকটু জটিল উপায়ে, দ্বৈতচিন্তার প্রয়োগ ঘটিয়ে সেও এই কথা মেনে নিয়েছে। তাহলে সেই কি একা এক ব্যক্তি যে সেই সত্যিকারের স্মৃতির ধারক?

অসাধারণ সব পরিসংখ্যানে ভরে উঠছে টেলিস্ক্রিন। গেলো বছরের সঙ্গে একটা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে বলা হচ্ছে- খাদ্য, বস্ত্র বেশি উৎপাদন হয়েছে, তৈরি হয়েছে অধিকতর বাসস্থান, আসবাবপত্র, বেশি রান্নার পাত্র, জ্বালানি, আরও বেশি জাহাজ, বেশি সংখ্যক হেলিকপ্টার, বেশি পুস্তক, আর বেশি বেশি শিশুও… রোগবালাই, অপরাধ আর মস্তিষ্কবিকৃতি ছাড়া সবকিছুই বেশি বেশি। বছর-বছর আর মিনিটে মিনিটে সবকিছুই তরতর করে বেড়ে উঠছে উপরের দিকে। একটু আগে সাইম যেমনটা করছিলো ঠিক তেমনি হাতের চামচটি দিয়ে টেবিলের ওপর লম্বা লাইন হয়ে ছড়িয়ে পড়া ম্যারম্যারে রঙের থকথকে বস্তুগুলোর ওপর আঁকিবুকি শুরু করলো উইনস্টন। বড় তিক্ত মনে এই বাহ্যিক জীবনবিন্যাস নিয়ে ভাবতে বসলো সে। সবসময়ই কি জীবনটা এমনই ছিলো? ক্যান্টিনময় চোখ ঘুরিয়ে নিলো, দেখলো একটি অনুচ্চ ছাদের কক্ষে মানুষ গিজগিজ করছে। অসংখ্য শরীরের গন্ধে ঘৃণ্য পরিবেশ, ভাঙ্গাচোরা ধাতব চেয়ার-টেবিল এত ঠাসাঠাসি করে বসানো যে বসলেই কনুই লেগে যায়, বাঁকানো চামচ, বেঁকে যাওয়া ট্রে, মোটা সাদা মগ; যার উপরটা তেলতেলে, প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে ময়লার আস্তর, আর ফালতু

জিন ও কফির মিলিত টক-টক গন্ধ, ধাতবরঙা স্ট্যু আর ময়লা কাপড়। এসবের মাঝে আপনার পাকস্থলী আর ত্বক সদাই যেনো প্রতিবাদী হয়ে বলতে থাকে এই কথা, তোমার যা অধিকার তা থেকে তুমি প্রতারিত হচ্ছো। এটা সত্য যে খুব একটা পার্থক্য টানা যাবে এমন কোনও স্মৃতিও তার নেই। ভালোভাবেই মনে করতে পারে একটি সময়ও ছিলো না যখন পর্যাপ্ত খাদ্য ছিলো, ছেঁড়া মোজা বা ছেঁড়া গেঞ্জি-জাঙিয়া পরতে হয়নি, আসবাবপত্র সবসময় দেখেছে ভাঙাচোরা, নড়বড়ে, অনুষ্ণ ঘর, টিউব ট্রেনে ঠেলাঠেলি, বাড়িগুলোতে আস্তর খসে খসে পড়ছে, কালচে রুটি, চায়ের আক্রা, বিস্বাদময় কফি, অপর্যাপ্ত সিগারেগ- সিনথেটিক জিন ছাড়া কোনও কিছুই সস্তা নয়, প্রাচুর্য নেই। কারো শরীর যখন বুড়িয়ে যায় তখন এগুলো আরও মন্দ আকার নেয়। যখন অস্বস্তি, আবর্জনা আর অভাবগ্রস্ততায় কারো হৃদয় আক্রান্ত হয়, দীর্ঘ শীতে কাবু থাকে, একটাই মোজা পরতে হয় দিনের পর দিন, লিফট যখন কখনোই কাজ করেনা, পানি ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, খসখসে হয় সাবানের টুকরো, সিগারেট যখন ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেতে হয়, আর খাদ্যের হয় এমন অগ্রাহ্য স্বাদ, তখন ওই বুড়িয়ে যাওয়াকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা চলে কি? আর কেনই এগুলো অসহনীয় ঠেকবে যখন অতীতের কোনও স্মৃতিই এর চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিলো না?

আরও একবার গোটা ক্যান্টিনে চোখ ঘুরিয়ে নিলো উইনস্টন। প্রায় প্রত্যেকেরই চেহারা কুৎসিত, নীল ওভারঅল ছাড়া অন্য কিছু পরলেও এদের এমন কুৎসিতই দেখাতো। কক্ষের দূরের দিকটাতে একটি টেবিলে একা বসে দুঁদে মাছির মতো দেখতে একজন কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন আর সন্দেহভরা চোখ দু’টি এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছেন। পার্টি তার কর্মীদে জন্য যে শারীরিক গঠন নির্ধারন করে দিয়েছে- লম্বা, পেশিবহুল যুবক, গভীর-বক্ষা, উজ্জ্বল চুলের নারী, রোদে পোড়া, বেপরোয়া ভাব- নিজের দিকে না তাকালে বিষয়টি এমনই এবং ভালো করেই তা বর্তমান বলে বিশ্বাস হয় উইনস্টনের কাছে। কিন্তু বাস্তবিক হচ্ছে, যতটা তার বিচারবুদ্ধি বলে, এয়ারস্ট্রিপ ওয়ানের অধিকাংশ মানুষই এখন বেটেখাটো, কালো আর অবহেলিত। কৌতুহলের বিষয় এই মাছি-আকৃতির মানুষটি মন্ত্রণালয়ের কাজে কিভাবে ঢুকে পড়লো? বেটে মোটা মানুষগুলো, জীবনের গোড়ার দিকেই গায়ে মেদ জমিয়ে ফেলে, খাটো খাটো পায়ে দ্রুত-হন্তদন্ত হাঁটে, আর তাদের ভোমা-দুর্বোধ্য মুখমণ্ডলে কুঁতকুঁতে চোখ। দলের প্রতিপত্তির মতো করে এই ধরনের মানুষগুলোর সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে।

আরেকবার তুর্যধ্বনি বাজিয়ে প্রাচুর্য মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা শেষ হলো আর শুরু হলো ধাতব সুরের সঙ্গীত। পরিসংখ্যানের ধামাকায় এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকার পর এবার মুখ থেকে পাইপটি বের করে আনলো পারসন্স।

‘প্রাচুর্য মন্ত্রণালয় এবার নিঃসন্দেহে ভালো কাজ করেছে,’ যেনো খুব বুঝতে পেরেছে এমন ভঙ্গিমায় মাথাটি নাড়াতে নাড়াতে বললো সে। ‘আরে শোনো স্মিথ, বুড়ো খোকা, আমার ধারনা তোমার কাছে আমাকে দেওয়ার মতো একটাও রেজর ব্লেড নেই!’ ‘একটিও না,’ বললো উইনস্টন। ‘গেলো ছয় সপ্তাহ ধরে আমি একটাই ব্লেড ব্যবহার করছি’ ‘ঠিক আছে- ঠিক আছে- ভাবলাম তোমাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি, বুড়ো খোকা।’
‘দুঃখিত,’ বললো উইনস্টন।

মন্ত্রণালয়ের ঘোষণার সময় সাময়িক বন্ধ থাকা প্যাঁকপ্যাঁক কন্ঠস্বরটি ফের চালু হয়েছে, আগের মতোন সমান সশব্দে। কি কারণেই যেনো উইনস্টনের ভাবনায় এলো মিসেস পারসন্সের কথা। তার ফাঁপা চুল আর মুখের ভাজে ভাজে জমে থাকা ময়লার আস্তর চোখে ভেসে উঠলো। দুই বছরের মধ্যে তার সন্তানেরা তাকে থট পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেবে আর মিসেস পারসন্স বাষ্পায়িত হয়ে যাবে। অন্যদিকে, পারসন্স কখোনোই বাষ্পায়িত হবে না। সাইমকে বাষ্পায়িত করা হবে। উইনস্টনকে বাষ্পায়িত করা হবে। ও’ব্রায়েনকে বাষ্পায়িত করা হবে, কিন্তু পক্ষান্তরে পারসন্সকে কখনোই বাষ্পায়িত করা হবে না। এই চক্ষুহীন, হংসকণ্ঠের জন্তুটি কখনোই বাষ্পায়িত হবে না। দুঁদে মাছির মতো দেখতে মানুষগুলো, যারা মন্ত্রণালয়ের গোলকধাঁধার মতো বারান্দাগুলোতে ভন ভন করে ঘুরছে, ওদেরও কখনোই বাষ্পায়িত করা হবে না। আর কালো চুলের মেয়েটি, ফিকশন ডিপার্টমেন্টের মেয়েটি- ওদেরও কখনোই বাষ্পায়িত করা হবে না। তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কে টিকে থাকবে আর কে অন্তিম পথের যাত্রী হবে: যদিও টিকে থাকার কারণটি কি তা নিশ্চিত করে বলা সহজ নয়। মস্তিষ্কে প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকুনি বোধ করে দিবাস্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরলো সে। পাশের টেবিলের মেয়েটি ইষৎ ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই সেই কালোকেশী। একপাশ থেকে কৌণিক দৃষ্টি ফেলে সে তাকিয়ে উইনস্টনের দিকে, গভীর কৌতুহলভরা সে চাহুনি। চোখাচোখি হতেই মেয়েটি দ্রুত দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলো।

উইনস্টনের মেরুদণ্ড বেয়ে ঘাম নেমে গেলো। ভীষণ এক ভীতি বয়ে গেলো তার শরীরের ভেতর দিয়ে। খুব দ্রুত তা চলেও গেলো বটে তবে মনে এক ধরনের অস্বস্তির অনুভূতি রেখে গেলো। মেয়েটি কেনো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো তাকে? কেনো সে সারাক্ষণই তাকে অনুসরণ করছে? দুর্ভাগ্যজনক যে, সে যখন পৌঁছায় তখন মেয়েটি এই টেবিলে বসেছিলো, না কি পরে এসে বসেছে তা উইনস্টন স্মরণ করতে পারছে না। কিন্তু গতকালও দুই মিনিটের ঘৃণা কর্মসূচির সময় মেয়েটি তার ঠিক পেছনে বসে পড়ে, যার আসলে কোনোও প্রয়োজন ছিলো না। বোঝাই যায় তার আসল

উদ্দেশ্য ওর কথা শোনা এবং পর্যাপ্ত জোরে সে চিৎকার করছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া।

পুরোনো চিন্তা আবার ফিরে আসে উইনস্টনের মন জুড়ে: মেয়েটি থট পুলিশের সদস্য হবে বলে তার মনে হয় না, তাহলে হতে পারে সে শখের গুপ্তচর, সবার জন্যই যে বড় বিপদের কারণ। তার জানা নেই, কতক্ষণ ধরে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে ছিলো, হতে পারে পাঁচ মিনিট ধরেই, আর এও সম্ভব পুরো সময়ই নিজের সকল অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলো উইস্টন। জনসমক্ষে কিংবা টেলিস্ক্রিনের আওতার মধ্যে থেকে চিন্তাজগতকে উদ্দেশ্যহীন পথে হাঁটতে দেওয়ার বিপদ ভয়ঙ্কর। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনও বিষয়ই আপনাকে বিপদে ফেলে দেবে। একটা সামান্য স্নায়ুবিক খিচুনি, একটি অবচেতন উদ্বেগের দৃষ্টি, স্বগোতোক্তির অভ্যাস- যে কোনোটা অস্বাভাবিক কিছু একটা নির্দেশ করে, ধরেই নেওয়া হবে, আপনি কিছু লুকোতে চাইছেন। একটি বেঠিক মুখোভঙ্গির (যেমন ধরুন কোনও যুদ্ধ জয়ের ঘোষণার সময় আপনাকে নিস্পৃহ দেখাচ্ছে) প্রকাশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এনিয়ে নিউস্পিকে একটি শব্দও রয়েছে, যাকে বলে ফেইসক্রাইম।

মেয়েটি তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসলো। হতে পারে মেয়েটি আদতে তাকে অনুসরণ করছেই না। হতে পারে পরপর দুই দিন তার কাছাকাছি মেয়েটির বসা স্রেফ ঘটনাক্রমেই ঘটে যাওয়া। উইনস্টনের সিগারেট নিভে গেছে। অতি সতর্কতায় সেটি টেবিলের এক কোনায় রাখলো। ভেতরের তামাকগুলো ধরে রাখতে পারলে কাজের শেষে ওটি আবার ধরাবে। হতেই পারে পাশের টেবিলের মেয়েটি থট পুলিশের চর, আর এও হতে পারে তিন দিনের মধ্যেই তার স্থান হবে ভালোবাসা মন্ত্রণালয়ের গরাদের ভেতর। কিন্তু তাই বলে একটি সিগারেটের গোড়া নষ্ট করার কোনও মানে থাকতে পারে না। সাইম তার হাতের কাগজটি ভাজ করে পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো। পারসন্স ফের বকবক শুরু করেছে।

‘তোমাকে বলেছি নাকি, বুড়ো খোকা,’ পাইপের গোড়া চেপে ধরে ঘুরাতে ঘুরাতে বললো সে, ‘আমার পাজি দুটো পুরান বাজারের এক মহিলার স্কার্টে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো। ওরা দেখতে পেলো মহিলাটি বি.বি’র একটি পোস্টার ছিঁড়ে সসেস পেঁচিয়ে নিচ্ছে। সন্তর্পণে ওর ঠিক পেছনে গিয়ে দেয়াশলাই ঠুকে দিলো আগুন ধরিয়ে। আমার ধারনা, ভালোই পুড়েছে। ছোট দুই পাঁজি! তবে বেশ চটপটে। স্পাইজে আজকাল ওরা প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে- ভালোই আমাদের সময় এমন প্রশিক্ষণ পাইনি। তুমি কি জানো, ওদের কাছে কি আছে? চাবির ছিদ্র দিয়ে কথা শুনার এক ধরনের শ্রবনযন্ত্র পার্টি ওদের দিয়েছে। এক রাতে আমার কন্যা ওগুলোর একটি বাড়িতেও নিয়ে এসেছিলো- আমাদের বসার ঘরের দরজা থেকে পরীক্ষা করে দেখেছে, বললো খালি কানে যতটুকু শুনতে পায়

এর শব্দ তার দ্বিগুন। অবশ্যই এটি খেলনা বৈতো নয়, তারপরেও এতেই কাজ দিচ্ছে, ওরা ঠিক ঠিক ধরে ফেলতে পারছে।

ঠিক এই সময়ে টেলিস্ক্রিনে কানফাটা সিটি বেজে উঠলো। কাজে ফিরে যাওয়ার সংকেত। টেবিলের তিনজনই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, লিফটের কাছে পৌঁছানোর লড়াইয়ে সামিল হতে। আর অমনি উইনস্টনের সিগারেটের শেষাংশের তামাকগুলো ঝুরঝুর করে নিচে পড়ে গেলো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডায়রি লিখছিলো উইনস্টন।

তিন বছর আগের কথা। কোনও এক সন্ধ্যার অন্ধকারে, বড় রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি একটি সরু গলির ভেতর দেয়াল ঘেঁষে দরজাপথের পাশেই সড়কবাতির নিচে দাঁড়িয়েছিলো মেয়েটি। এই গলির সড়কবাতিগুলো কদাচই আলো দিতো। তরুণী-মুখ, গাঢ় রং মাখা। এই রংটির সত্যিই একটা আবেদন আমার কাছে ছিলো, এর সাদাটেরূপ, ঠিক মুখোশের মতো, আর লাল-উজ্জ্বল ঠোঁট। পার্টির মেয়েরা তাদের মুখে রঙ মাখায় না। সেই সন্ধ্যার সড়কে আর কেউই ছিলো না, কোন টেলিস্ক্রিন ছিলো না। মেয়েটি বললো.. দুই ডলার। আমি-

ওই মুহূর্তে লেখা চালিয়ে যাওয়া ভীষণ কঠিন মনে হলো। চোখ দুটি বন্ধ করে আঙ্গুল চেপে ধরলো সে। দৃশ্যটি ভাবনা থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেটাই ঘুরে ঘুরে আসছে। তার মনে হচ্ছিলো নোংরা ভাষায় গালি-গালাজ করে, দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠোকে নয়তো কালির দোয়াতটা জানালা দিয়ে সজোরে বাইরে ছুড়ে দেয় - সহিংস কিংবা বেদনাদায়ক কিছু একটা করে, হৈচৈ হট্টগোল বাঁধিয়ে দেয় যাতে স্মৃতি থেকে সরে যায় সবকিছু।

স্নায়ুতন্ত্রটিই আসলে সবচেয়ে বড় শত্রু। যে কোনো ক্ষণেই আপনার ভেতরের দুশ্চিন্তাটা কিছু একটা বাহ্যিক লক্ষণ হয়ে আপনার ওপর ক্রিয়া করতে থাকবে। এবার তার মাথায় এলো সপ্তাহ কয়েক আগের এক স্মৃতি। রাস্তায় উল্টো দিক থেকে আসছিলো একজন। অতিসাধারণ দেখতে, দলেরই সদস্য। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ, লম্বাটে-পাতলা গড়নের, হাতে ব্রিফকেস। দুজনের মধ্যে যখন কয়েক মিটারের দূরত্ব, তখন হঠাৎই তার মনে হলো লোকটির মুখমণ্ডলের বাম দিকটা খিচে ভেঙ্গেচুড়ে যাচ্ছে। এরপর ঠিক যখন দুজন-দুজনকে অতিক্রম করে গেলো তখনও একই ব্যাপার দেখতে পেলো। ঘটনাটি এক লহমার, ঠিক যেমন বিদ্যুৎ ফড়কানো কিংবা শিহরণ জাগানোর মতো কিছু একটা। ক্যামেরার ক্লিকে শাটার পড়ার মতোই ক্ষণস্থায়ী। তখনই তার মনে হয়েছিলো এই বেচারা তো

মহাবিপদে আছে। বিপদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপদ ঘুমের মাঝে বকা। যতটা সে বুঝতে পারে, এ থেকে মুক্তি নাই।

গভীর শ্বাস নিয়ে আবার লিখতে শুরু করলো সে: আমি তার সঙ্গে দরজাপথ পেরিয়ে পেছনের আঙ্গিনা ধরে বেজমেন্টের একটি রান্নাঘরে ঢুকলাম; দেয়ালে লাগোয়া একটি বিছানা পাতা, টেবিলের ওপর একটি বাতি জ্বলছে মৃদু আলোতে; মেয়েটি -

দাঁতে দাঁত চেপে ধরলো সে। মনে হলো থুঁতুর পিচকিরি ছিটাবে। তখনই বেজমেন্টের রান্নাঘরের সেই নারীর পাশাপাশি তার মনোজগতে এসে হানা দিলো ক্যাথরিন, তার স্ত্রী। উইনস্টন বিবাহিত ছিলো, একটা সময় পর্যন্ত বিবাহিত ছিলো, সম্ভবত এখনও সে বিবাহিত, যদ্দুর জানে, তার স্ত্রী এখনও মারা যায়নি। আবারও যেনো বেজমেন্টের রান্নাঘরে গুমোট গরম আবহাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছে সে, ছারপোকা, নোংরা কাপড়, সস্তা সুগন্ধীর মিশ্রনে এক উদ্ভুট গন্ধ, তবে সম্মোহনী, কারণ পার্টির মেয়েরা কখনোই সুগন্ধী মাখে না, এমনকি মাখার কথা কল্পনাও করতে পারে না। কেবল প্রোলরাই সুগন্ধী মাখে। তার মনে ব্যাভিচারের ভাবনার সঙ্গে ওই গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো।

মেয়েটির সঙ্গে যখন গেলো সেটি ছিলো ওই সময়ে অন্তত দুই বছরের মধ্যে তার প্রথম স্খলন। পার্টিতে পতিতাগমন নিষিদ্ধ। তবে এটিও সেইসব নীতির একটি যা মাঝেমধ্যে ভাঙ্গার সাহস করা যায়। ধরা পড়লে বিপদ আছে। কিন্তু এটি জীবন-মরণ কোনও বিষয় নয়। গণিকাসহ হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলে, যদি অন্য কোনো অপরাধে সম্পৃক্ততা না থাকে, বাধ্যতামূলক শ্রম ক্যাম্পে আপনার পাঁচ বছরের অন্তরীণ জীবন, এতটুকুই সাজা, এর বেশি নয়। আবার আইনের চোখ বাঁচিয়ে কাজটি করাও কঠিন কিছু নয়। অপেক্ষাকৃত গরীবদের কোয়ার্টারগুলোতে নারীরা নিজেদের বেচতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। এমনকি এক বোতল জিনের বিনিময়েই ওরা আপনার ভোগের পণ্য হয়ে বিকোয়। প্রোলদের জন্য জিন নিষিদ্ধ বলেই হয়তো আরও সহজ। কৌশলে দলই পতিতাবৃত্তিকে উৎসাহিত করে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলো অবদমন করে রাখার চেয়ে সেগুলো মিটিয়ে ফেলার একটি পথ রাখতেই হয়। ছোট ছোট পাপস্খলণ বড় কিছু নয়। বিশেষ করে যখন তা গোপনে-নিরানন্দে ঘটে চলে, আর তাতে জড়িত থাকে কেবলই নিম্নস্তরের ঘৃণিত নারীরা। দলের সদস্যদের জন্য প্রকীর্ণতা ক্ষমার অযোগ্য। আর এটি এমন এক অপরাধ যে বিচারের মুখে অভিযুক্তকে তা স্বীকার করে নিতেই হয় - সুতরাং অনেকেই এমন অপরাধ সংগঠনের কথা চিন্তায়ও আনে না।

পার্টির উদ্দেশ্য কিন্তু স্রেফ নারী ও পুরুষদের এমন একটি নীতির প্রতি অনুগত করে তোলা নয়; বরং প্রকৃত এবং অঘোষিত উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌনকর্মের যে আনন্দ তা বিলীন করে দেওয়া। ভালোবাসা নয়, এখানে

যৌনকামনাই শত্রু, হোক তা বিবাহভুক্ত কিংবা বহির্ভূত। দলের সদস্যদের মধ্যে বিয়ে হতে হলে এ জন্য গঠিত কমিটির অনুমোদন লাগে। নীতির বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ঘোষণা নেই; তবে পাত্র-পাত্রীকে শারীরিকভাবে আকৃষ্ট মনে হলে বিয়ের অনুমতি মেলে না। বিয়ের একমাত্র স্বীকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে দলের সেবায় শিশুর সংখ্যা বাড়িয়ে চলা। প্রশ্রাবদ্বারে সিরিঞ্জ দিয়ে ওষুধ ঢোকানোর মতো একটি বিরক্তিকর কাজ হিসেবেই দেখা হয় যৌনমিলনকে। কথাগুলো সরাসরি হয়তো কোথাও বলা হয় না, কিন্তু দলের সদস্যদের শিশু বয়স থেকেই যৌনতার প্রতি আগ্রহ ঘষে ঘষে মুছে দেওয়া হয়। জুনিয়র এন্টি সেক্স লিগের মতো কিছু সংগঠন রয়েছে যারা নারী-পুরুষ উভয়কেই পুরোপুরি কৌমার্যের পথে ধরে রাখতে কাজ করছে। শিশুদের জন্ম হচ্ছে কৃত্রিম পরিনিষেকে (আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন, নিউস্পিকে যাকে বলা হয় আর্টসেম) আর বেড়ে উঠছে সরকারি প্রতিষ্ঠানে। এটাই, উইনস্টন জানে সবমিলিয়ে হয়তো ঐকান্তিকভাবে কাজটি হচ্ছে না, তবু কোনও না কোনওভাবে এটাই দলের সাধারণ আদর্শ। যৌনতায় আগ্রহকে হত্যা করতে চায় দল, অথবা, হতে পারে হত্যা নয়, এর একটা বিকৃত রূপ দিতে চায়, নোংরা করে তুলতে চায়। সে জানে না, কেন এমনটি করা হচ্ছে, তবে মনে হচ্ছে এটাই হওয়া উচিত। আর যখন বিষয়টিতে নারীরা সম্পৃক্ত, দলের এই প্রচেষ্টা যথেষ্ঠই সফল।

আবারও চিন্তাজগতে ক্যাথরিনের প্রবেশ। নয়-দশ বছর হবে, এগারোও হতে পারে, তারা আলাদা হয়ে গেছে। কৌতুহলের বিষয়, কদাচই সে তার কথা ভাবে। কখনো দিনের পর দিন সে ভুলেই বসে থাকে যে একদা তার বিয়ে হয়েছিলো। তারা একসঙ্গে ছিলো পনেরো মাসের মতো। দল তালাকের অনুমতি দেয় না, বরং বাচ্চাকাচ্চা না থাকলে আলাদা থাকার বিষয়টিকেই উৎসাহিত করে।

ক্যাথরিন লম্বা গড়ণের, সুন্দর চুলের মেয়ে, অসাধারণ দেহ সৌষ্ঠব। ঈগলসদৃশ দৃঢ়-বাঁকানো চেহারা, যা দেখলে যে কেহই বলবে ‘অনন্যা’, অন্তত যতক্ষণ না তারা বুঝবে এর ভেতরটা ফাঁপা। বিবাহিত জীবনের খুব গোড়াতেই সে বুঝে ফেলেছিলো- যদিও তুলনা করে দেখার মতো অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গেই তার খুব একটা ঘনিষ্টতা কখনোই হয়নি- তার পরেও যতজন দেখেছে তার মনে হয়েছে, সন্দেহাতীতভাবেই এই মেয়েটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে নির্বোধ, ফালতু আর শুণ্যমনা। পার্টির স্লোগানের বাইরে তার মাথায় আর কিছু নেই। দলের কথা মনের মধ্যে ধরে রাখতে না পারার মতো এতটা নিবুর্দ্ধিতা আর কারো মধ্যে দেখা যাবে না। মনে মনে সে তার নাম দিয়েছিলো ‘মানব শব্দযন্ত্র’। তারপরেও তার সঙ্গে বসবাস চলতো যদি সহবাসের বিষয়ে তাদের বনিবনাটা হয়ে যেতো।

তাকে ছুঁলেই কুঁকড়ে শক্ত হয়ে যেতো। তাকে জড়িয়ে ধরা আর একটি কাঠের পুতুলকে জড়িয়ে ধরার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। আরও

অদ্ভুত ছিলো - যখন তাকে কাছে টানতো , তখন মনে হতো ও যেনো প্রাণপণে তাকে দূরে ঠেলছে। তার শক্ত হয়ে থাকা নির্লিপ্ত পেশিগুলো অন্তত সেই বার্তাই দিতো। না ছিলো প্রতিরোধ , না সহযোগিতা। কেবল চোখ বন্ধ করে নিজেকে সমর্পন করে শুয়ে থাকতো। বিষয়টি ছিলো অস্বাভাবিকরকম বিরক্তিকর , আর কিছুক্ষণ পর তা হয়ে উঠতো ভয়াবহ অসহনীয়। তারপরেও মেনে নিয়ে একসঙ্গে থাকা যেতো যদি তারা দুজনই কৌমার্য ধরে রাখার ব্যাপারে একমত হতে পারতো। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ক্যাথরিনই তাতে বাঁধ সাঁধলো। সে বললো , সম্ভব হলে তারা অবশ্যই একটা বাচ্চা নেবে। সুতরাং কাজটি ওভাবেই চললো। একেবারেই অসম্ভব হয়ে না পড়লে সপ্তাহে একদিন , নিয়ম করেই চলতো। সপ্তাহের দিনটি এলেই সকালেই মনে করিয়ে দিতো সন্ধ্যার কাজটির কথা। এ জন্য দুটি কথা ব্যবহার করতো ও- একটি ছিলো 'সন্তান পয়দার কাজ ' অন্যটি 'দলের প্রতি দায়িত্ব ' (সত্যি এই দুটি কথাই সে বলতো)। যখনই নির্দিষ্ট দিনগুলো আসতো উইনস্টনের ভেতর একটি ইতিবাচক শঙ্কার অনুভূতি কাজ করতো , তবে ভাগ্যক্রমে সন্তান আগমনের খবর মিলতো না। আর অবশেষে দু 'জনই এই প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত দেওয়ার বিষয়ে একমত হলো। আর এর কিছু দিনের মধ্যেই তারা আলাদা হয়ে গেলো।

একটা নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস ফেললো উইনস্টন। কলম তুলে নিয়ে ফের লিখতে শুরু করলো:
আচমকা মেয়েটি নিজেকে বিছানায় ছুড়ে দিলো . কোনো ধরনের রাগমোচনের প্রস্তুতি ছাড়াই . কল্পনাতীত বিভৎসতায় সে তার স্কার্টটি উপরে তুললো / আমি-

সে দেখছে , সে যেনো বাতির মৃদু আলোয় দাঁড়িয়ে , নাসিকারন্দ্রে এসে লাগছে ছারপোকার গন্ধ , সস্তা সুগন্ধী। আর হৃদয়খানি বিদীর্ণ হচ্ছে পরাজয়ের গ্লানি ও অপরাধবোধে। এরই মাঝে ভাবনা জগতে এসে মিশলো ক্যাথরিনের ধবল দেহখানি , পার্টির সংবেশন ক্ষমতায় যা চিরতরেই বরফহীম হয়ে গেছে। সবকিছুই এমন কেনো হবে ? কেনো তার জন্য নিজের একজন নারী থাকবে না। কেনো তাকে বছরের বিরতিতে এমন ঘৃণ্য নোংরা নারী সান্নিধ্যে আসতে হবে ? একটি সত্যিকারের ভালোবাসার সম্পর্ক মোটামুটি অচিন্তনীয় বিষয়। পার্টির নারীগুলো সবই একই রকম। পার্টির প্রতি আনুগত্যের মতোই কৌমার্য্যরে শুদ্ধতার বিষয়টি তাদের মনের গভীরে প্রোথিত। সতর্ক বাল্যশিক্ষায় , খেলায় , শীতল স্নানে , স্কুলের পাঠে , স্পাইজে , ইউথ লিগে , বক্তৃতায় , মিছিলে , গানে , স্লোগানে , যন্ত্রগীতে সবকিছুর মধ্য দিয়েই বিষয়টি তাদের মধ্যে চালিত। এতে তাদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অনুভূতিগুলোই গেছে মরে। তার যুক্তিগুলো বলছে , কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে , কিন্তু হৃদয় মোটেই তা বিশ্বাসে রাজি নয়। এরা সব অজেয় , ঠিক যেমনটি দল চায় তেমনভাবেই অলঙ্ঘনীয়। আর সে কি চায় ! সে ভালোবাসা চায় না , বরং জীবনে একটি বার হলেও সে এই শুদ্ধতার দেয়ালটি ভেঙ্গে দিতে

চায়। যৌনতা , সাফল্য দুইই এখানে বিদ্রোহের নামান্তর। এখানে ইচ্ছা বা প্রত্যাশার নাম চিন্তাঅপরাধ। এমনকি একবারও যদি শয্যায় সঙ্গমে সে যৌনাবেদনে জাগরুক এক ক্যাথরিনকে পেতো তা হয়ে যেতো শ্লীলতাহানি , অথচ সেতো তার স্ত্রীই ছিলো।

যাইহোক গল্পের পরের অংশ লেখা হলো ডায়রিতে। সে লিখলো :
আমি বাতির সলতেটা বাড়িয়ে দিলাম ৗ আর তখন আমি মেয়েটিকে আরো আলোয় দেখতে পেলাম -

অন্ধকার কেটে গেলে হারিকেনের দুর্বল আলোকেই বেশ উজ্জ্বল মনে হয়। এই প্রথম সে মেয়েটিকে ঠিক মতো দেখতে পেলো। এক পা মেয়েটির দিকে এগিয়ে ফের থমকে দাঁড়ালো , তার মধ্যে তখন কামলিপ্সার সহিংস রূপ। ঠিক যে কাজটি সে করতে যাচ্ছে তা নিয়ে বেদনার্তভাবেই আবার সে সচেতনও। খুবই সম্ভব , বের হওয়ার পথেই টহলদাররা তাকে ধরে ফেলবে ; হতে পারে এ জন্য তারা এরই মধ্যে বাইরে অপেক্ষমান। এখানে যে কাজে সে এসেছে তা না করেও যদি এখুনি বের হয়ে যায় তাহলেও !

একটু দ্রুতই লিখে চলেছে সে , সেই একই অবিন্যস্ত হাতের লেখায় :
আমি বাতির আলোতে দেখতে পেলাম স্রেফ একটা বুড়ি . নিদেন পক্ষে পঞ্চাশ বছরতো হবেই ৗ কিন্তু আমি এগিয়ে গেলাম ৗ এবং যা করার ঠিক তাই করলাম ৗ

আবারও চোখের ওপর আঙুলগুলো চেপে ধরলো সে। অবশেষে কথাগুলো লিখে ফেলেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সেই যে নোংরা ভাষায় চিৎকার করে বলার তীব্র বাসনা তা তীব্রতর হলো।

সপ্তম অধ্যায়

‘আশা যদি কিছু থেকে থাকে .’ লিখলো উইনস্টন ‘তা ওই প্রোলদের মধ্যেই প্রোথিত। ’

আশা যদি কিছু থেকে থাকে , অবশ্যই তা প্রোলদের মধ্যে প্রোথিত , কারণ একমাত্র মৌচাকের মৌমাছির মতো ঠাসাঠাসি করে থাকা , ওশেনিয়ার মোট জনসংখ্যার ৮৫ ভাগের ভাগীদার এই জনগোষ্ঠীই একদিন মহীরুহের মতো গড়ে ওঠা পার্টিকে ধ্বংস করে দেওয়ার শক্তি হয়ে উঠতে পারে। ভেতর থেকে পার্টির পতন সম্ভব হবে না। এর শত্রুরা , যদি আদৌ এর কোনো শত্রু থেকে থাকে , কোনোভাবেই একজোট হতে পারবে না , এমনকি একে অপরকেই চিনবে না তারা। এমনকি কিংবদন্তির ব্রাদারহুডও যদি টিকে থাকে , তেমন একটা সম্ভাবনা যেহেতু রয়েছে , এটা ভাবা অসম্ভব যে এর সদস্যরা দুইজন বা তিনজন করেই সমবেত হতে পারবে। বিদ্রোহ মানেই হচ্ছে চোখে চোখ রেখে , কণ্ঠস্বর উচিয়ে প্রতিরোধের উচ্চারণ।

প্রোলরা পারবে , কিন্তু তাও যদি তারা কভু তাদের এই শক্তি সম্মন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে তবেই। এ জন্য তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বেছাতে হবে না। কেবল জেগে উঠতে হবে। অশ্বশক্তির ঝাঁকুনি দিয়ে মৌমাছির মতো ছুটতে হবে। কাল সকালেই যদি তারা পার্টিকে খান খান করে দিতে চায় , পারবে। নিঃসন্দেহে খুব কাছাকাছি সময়ে , নয়তো অনেক দেরিতে হলেও তারাই এটা করবে। আর এখনো-!

উইনস্টনের মনে পড়ে একদিন এক ভিড়ের সড়কে হাঁটছিলো সে। এসময় শত শত নারী কণ্ঠের আওয়াজ কানে আসে। একটু সামনেই গলি সড়কের ভেতর থেকে ফেটে পড়া বিক্ষোভের শব্দ। সে ছিলো ক্রোধ আর ঘৃণার ভীষণ ভয়াল চিৎকার , তীব্র তারস্বরের উচ্চারণ ‘উহ-উ-উ-উ-উহ!’ ঘণ্টারধ্বনি যেমন অনুরুণন তুলে ইথারে ছড়ায় , ঠিক তেমনি। তার হৃদয়খানি লাফিয়ে উঠেছিলো। মনে হয়েছিলো , শুরু বুঝি তাহলে হয়েই গেলো! দাঙ্গা ! প্রোলরা অবশেষে বাঁধ ভাঙছে ! অকুস্থলে পৌঁছে সে দেখতে পেলো শ ’ তিনেক নারী সমবেত হয়েছে সড়কপাশের মার্কেটের দোকানগুলো ঘিরে। তাদের চেহারায় বিয়োগান্তের ছাপ। যেনো তারা গভীর সমুদ্রে ডুবন্ত কোনো জাহাজের যাত্রী। সে যখন ওখানে , ততক্ষণে সমবেত ক্ষোভ ব্যক্তিগত ঝগড়াঝাটিতে রূপ নিয়েছে। জানা গেলো স্টলগুলোর একটিতে টিনের সসপ্যান বিক্রি হয়। ঠুনকো ও ফালতু মানের সসপ্যান। রান্নার পাত্রের আক্রা লেগেই থাকে। আর ওই সময়টিতে সরবরাহ ছিলো অপ্রত্যাশিত ভাবেই কম। যারা পেয়ে গেছে তাদের ওপর হামলে পড়ছে অন্যরা। যারা পেয়েছে তারা সটকে পড়তে পারলে বাঁচে , কিন্তু অন্যরা তাদের যেতে দিচ্ছে না। দোকানির বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ এনে হট্টগোল বাঁধিয়ে দিয়েছে। অভিযোগ , অন্য কোথাও সসপ্যান মজুদ করে রেখেছে দোকানি।

এ পর্যায়ে নতুন করে আবারও চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হলো। অতিপ্রকাণ্ড বপুর দুই নারীর একজন খোলা এলোমেলো চুলে ছুটে গিয়ে আরেকজনের হাতে ধরা সসপ্যানটিতে ছোঁ মারলো। এরপর শুরু হলো টানা - টানি আর সঙ্গে সজোরে চিৎকার। কিছুক্ষণের টানাটানিতেই হাতলটি ছুটে চলে গেলো এক জনের হাতে অন্য জনের হাতে সসপ্যান। মহাবিরক্তি নিয়ে উইনস্টন এদের কাণ্ড -কারখানা দেখছিলো। মাত্র কয়েকশ ’ কণ্ঠের চিৎকারে একটু আগেই যে শক্তি সে মনে মনে দেখতে পেয়েছিলো তা নিমেষে উবে গেলো। তার মনে হলো - ঠিক এই কারণেই এরা কখনো এমন আওয়াজ তুলতে পারবে না যা গুরুত্ব রাখে।

সে লিখলো:

ওরা যতদিনে সচেতন হয়ে না উঠবে ততদিনে বিদ্রোহী হতে পারবে না , আর যতদিনে বিদ্রোহী না হবে ততদিনে সচেতন হতে পারবে না 7

হ্যাঁ ঠিক একথাটিই, তার মনে হলো, পার্টির পাঠ্যবইগুলোতে ঠিক এমন একটি কথাই লেখা রয়েছে। সকল বন্ধন থেকে প্রোলদের মুক্ত করতে হবে, এটাই পার্টির দাবি। বিপ্লবের আগে ওরা পুঁজিপতিদের চরম নিষ্পেষণের শিকার হয়েছে, ওরা ভুখা থেকেছে, মার খেয়েছে, কয়লার খনিতে নারীরা জবরদস্তি শ্রম খেটেছে (বাস্তবতা হচ্ছে নারীরা এখনো কয়লার খনিতে শ্রম খাটে), শিশুরা ছয় বছর বয়সেই বিক্রি হয়েছে কারখানাগুলোর হাতে। অথচ পাশাপাশি দ্বৈতচিন্তার নীতি বাস্তবতায়, পার্টি মনে করে প্রোলরা প্রাকৃতিকভাবেই অধস্তন, গুটিকয় সাধারণ বিধির প্রয়োগে ওদের পশুর মতো অসহায়ত্বে ফেলে রাখাই বিধান। বাস্তবতা হচ্ছে, প্রোলদের সম্পর্কে খুব কমই সবার জানা আছে। জানার প্রয়োজনও খুব বেশি নয়। ওরা কাজ করবে, সন্তান জন্ম দেবে, এর বাইরে ওদের কোনোও কাজেরই কোনো গুরুত্ব নেই। আর্জেন্টিনার বিশাল সমতল ভূমিতে ছাড়া গরু-বাছুরের মতোই ওরা ছাড়া থাকে, কিন্তু ওরা এমনই এক জীবনে অভ্যস্ত যাকে প্রকৃতির বিধান বলেই মেনে নিয়েছে, এর সঙ্গেই ওরা সইয়ে নিয়েছে নিজেদের জীবন।

নর্দমায় ওদের জন্ম, নর্দমায়ই বেড়ে ওঠা। বারো বছরেই ওরা শ্রমিক, আর কাজের মাঝেই কখন পার হয়ে যায় ওদের জীবনের সুন্দর হয়ে ওঠার সময়, যৌনতার অনুভূতিকে বুঝে ওঠার বয়স। বিশে ওরা বিয়ে করে, ত্রিশেই মধ্যবয়ষ্ক হয়ে ওঠে আর এদের অধিকাংশই ষাটের মধ্যেই বরণ করে নেয় মৃত্যুকে। গতর খাটা কাজ, বাচ্চাপালন, প্রতিবেশির সঙ্গে ঝগড়া, সিনেমা, ফুটবল, বিয়ার আর সর্বোপরি জুয়ায় জড়িত ওদের জীবন। আর এর মধ্যেই ঘুরপাক খায় ওদের মন ও মননশীলতা। ওদের নিয়ন্ত্রণ এতটুকু কঠিন কিছু নয়। থট পুলিশের গুটি কয় চর ওদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, কথায় কথায় মিথ্যা গুজব ছড়ায় আর ভয়ঙ্কর কিংবা ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে এমনদের চিহ্নিত করে গুম করে দেয়।

ওদের মধ্যে দলের আদর্শ ঢুকিয়ে দেওয়ার কোনও প্রচেষ্টাই নেই। প্রত্যাশাও নেই যে প্রোলরা রাজনৈতিক অনুভূতিতে চাঙা হবে। তাদের কাছে একটাই চাওয়া তা হচ্ছে আদিম দেশপ্রেম যা ওদের দীর্ঘ কর্মঘণ্টা আর আরও কম রেশনেও গদগদ করে রাখবে। আর এমনকি অখুশি বা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেও, যা ওরা মাঝে মধ্যে হয়ও, তাদের সে অসন্তুষ্টির বোধ কোনও পরিণতি পায় না, কারণ এই অসন্তোষ সাধারণে ছড়িয়ে দেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়, বরং ওরা কোনো একটি ক্ষোভের মাঝেই ঘুরপাক খায়, আর তারই নিরসন চায়। অপেক্ষাকৃত বড় ক্ষতিকর দিকগুলো ওদের চোখ এড়িয়ে থাকে।

প্রোলদের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বাড়িতে টেলিস্ক্রিনও নেই। সিভিল পুলিশ ওদের কম ঘাঁটায়। অপরাধীতায় ভরা লন্ডন। ভূ-খণ্ডের মাঝেই চোর, ডাকাত, পতিতা, মাদকব্যবসায়ী, প্রতারক, বাটপারদের এক

পূর্ণাঙ্গ ভূ-খণ্ড। কিন্তু এর সবকিছুই যেহেতু প্রোলদের নিজেদের মাঝেই ঘটে তাই এ নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই। নৈতিকতার সকল প্রশ্নে ওরা তাদের পুরুষানুক্রমিক ধারাই মেনে চলে। যৌনাচারের শুদ্ধিবাদ ওদের ওপর আরোপিত নয়। নির্বিচার যৌনাচারে নেই শাস্তির বিধান, বিবাহবিচ্ছেদে মানা নেই। আর এ কারণেই, প্রোলরা ধর্মীয় উপসনা করতে চাইলে তারও অনুমতি মেলে। ওদের ওপর সন্দেহের চোখ ঘোরপাক খায় না। ওদের জন্য পার্টির স্লোগানই হচ্ছে: ‘প্রোল আর পশুরা মুক্ত’।

নিচু হয়ে ঘায়ের জায়গাটি সাবধানে চুলকে নিলো উইনস্টন। এতে আবারও চুলকানি শুরু হয়েছে। বিপ্লবের আগের জীবন ঠিক কেমন ছিলো তা জানা অসম্ভব। আর সেই অসম্ভবেই বার বার ফিরে যাবেন আপনি। ড্রয়ার থেকে শিশুদের ইতিহাসের একটি পাঠ্যবই বের করে আনলো সে। বইটি মিসেস পারসন্সের কাছ থেকে ধার চেয়ে এনেছে। বই থেকে ডায়রিতে তুলতে শুরু করলো একটি অনুচ্ছেদ:

বইয়ে লেখা হয়েছে- পুরোনো দিনগুলোতে, গৌরবান্বিত বিপ্লবের আগে, আজ যে লন্ডনকে আমরা চিনি তেমন সুন্দর নগর এটি ছিলো না। সে ছিলো অন্ধকার, নোংরা, দুর্বিসহ এক লন্ডন যেখানে কেউ কদাচই পর্যাপ্ত খেতে পেতো, শত শত এবং হাজার হাজার দরিদ্র মানুষের পায়ে জুতো ছিলো না, ঘুমানোর জন্য মাথার ওপর আচ্ছাদন ছিলো না। তোমাদের মতো ছোট ছোট শিশুরা দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করতো, কাজ কম হয়ে গেলে ক্রুর মনিবরা ওদের ওপর চালাতো অত্যাচারের চাবুক, ওদের গন্ধময় শক্ত রুটির টুকরো আর পানি ছাড়া কিছুই খেতে দিতো না। এই ভয়াবহ দারিদ্রের পাশাপাশি গুটিকয় মাত্র বড় সুন্দর বাড়ি ছিলো যাতে ধনাঢ্যরা বাস করতো। যাদের দেখভাল করতেই নিয়োগ করা হতো জনা-ত্রিশেক চাকর-বাকর। এই ধনাঢ্যদের বলা হতো পুঁজিপতি। ওরা ছিলো মোটা, কুৎসিত চেহারার, ঠিক উল্টো পৃষ্ঠার ছবিটির মতো। তোমরা দেখতে পাচ্ছো- তার গায়ে লম্বা কালো কোট যাকে বলা হতো ফ্রক কোট, আর অদ্ভুত জ্বলজ্বলে হ্যাট, দেখতে ঠিক চুল্লির চোঙার মতো, ওরা বলতো টপ হ্যাট। এটাই ছিলো পুঁজিপতিদের পোশাক, তারা বৈ আর কারও এই পোশাক পরার অনুমতি ছিলো না। এই পুঁজিপতিরা গোটা বিশ্বের সবকিছুরই মালিক ছিলো, আর বিশ্বের অন্যসবাই ছিলো তাদের কৃতদাস। তাদের দখলে ছিলো সকল জমি, ঘর-বাড়ি, কারখানা আর অর্থসম্পদ। তাদের অমান্য করলেই কারাগারে নিক্ষেপ করতো, অথবা কাজ ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষুধায় মৃত্যুবরণে বাধ্য করতো। যদি কখনো কোনও সাধারণ মানুষ কথা বলতো কোনও পুঁজিপতির সামনে, তাকে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করেই থাকতে হতো, মাথা থেকে হ্যাট খুলে রাখতে হতো আর ‘প্রভু’ বলে সম্মোধন করতে হতো। সকল পুঁজিপতির যিনি প্রধান তাকে বলা হতো ‘রাজা’, আর-

উইনস্টন জানে আর কি কি থাকতে পারে এই বইয়ে। লম্বা আচিনের পোশাক পরিহিত বিশপদের কথা, বিচারকদের জন্য পশুর লোমে তৈরি গাউনের কথা, অপরাধীদের সাজার জন্য তৈরি কাঠের পিলোরি, গবাদির পাল, ঘানি, বহুলেজবিশিষ্ট চাবুক, লর্ড মেয়রের ভোজসভা, পোপের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে চুমু খাওয়ার রেওয়াজ এসবইতো। একটা প্রচলন ছিলো- বলা হতো জাস প্রাইমি নকটিস, শিশুদের পাঠ্য বইয়ে সম্ভবত তার উল্লেখ থাকবে না। এটি ছিলো এমন এক আইন যাতে প্রত্যেক পুঁজিপতি তার কারখানায় কাজ করে এমন প্রতিটি নারীকেই শয্যাসঙ্গী করতে পারতো।

আপনি কি করে জানবেন এর কতটা অসত্য? হতে পারে, বিপ্লবের আগের সময়ের চেয়ে গড়পড়তা মানুষের এখনকার জীবন ভালো কাটছে। কিন্তু এর বিপরীতে একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে আপনার হাড়ের ভেতরে জমে থাকা সুপ্ত প্রতিবাদ, আপনার যাপিত জীবনের অসহনীয় পরিবেশ নিয়ে সহজাত অনুভূতি, যা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রূপ নেয়।

উইনস্টনের মনে হলো আধুনিক জীবনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এর নিষ্ঠুরতা ও নিরাপত্তাহীনতায় নয়, বরং এর নগ্নতা, নোংরামি আর অস্তিত্বহীনতায় নিহিত। আপনি নিজের দিকটা দেখলেও দেখবেন, টেলিস্ক্রিন থেকে যে অনবরত মিথ্যার বেসাতি চলছে তার সঙ্গেই কেবল নয়, এর মধ্য দিয়ে দল যে আদর্শ অর্জন করতে চাইছে তারও সঙ্গেও জীবনের কোনও সাজুয্য নেই। দলের একজন সদস্যের জন্যও এর সেরা দিকগুলো হচ্ছে নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক মনোভাব পোষণ, একঘেঁয়ে কাজ, টিউবে একটু স্থান করে নেওয়ার লড়াই, ছিড়ে যাওয়া মোজায় পা গলানো, স্যাকরিন ট্যাবলেটে মিষ্টি উপভোগ আর সিগারেটের গোড়া বাঁচিয়ে ধূমপানের তৃষ্ণা নিবারণ। পার্টি যে আদর্শ নির্ধারণ করেছে তা বিশাল, ভয়াবহ আর জ্বলজ্বলে- ইষ্পাত আর কংক্রিটের এক জগত, দৈত্যাকায় যন্ত্র আর ভয়াল অস্ত্র- যুদ্ধবাজ আর গোঁড়াদের এক জাতি যা এগিয়ে চলছে যথার্থ যুথবদ্ধতায়, সবাই একই ভাবনা ভাবছে, একই স্লোগান তুলছে, টানা কাজ করে যাচ্ছে, যুদ্ধ করছে, জয় করছে, যন্ত্রণা দিচ্ছে- আবার যন্ত্রণাই ভোগ করছে- তিন কোটি মানুষের একই মুখ, একই চেহারা। বাস্তবতা হচ্ছে- ক্ষয়িষ্ণু নোংরা নগরে বুভুক্ষ মানুষগুলো ছেঁড়া জুতো পায়ে এদিক ওদিক ছুটছে, উনবিংশ শতাব্দীর ক্ষয়ে ক্ষয়ে পড়া বাড়িগুলো থেকে সদাই ছুটছে সিদ্ধ বাঁধাকপি আর বিষ্ঠার উৎকট গন্ধ। তার চোখে ভেসে উঠলো লাখ লাখ ডাস্টবিনে ভরা সর্বনেশে এক লন্ডন নগরী আর তা মিশে একাকার হয়ে গেলো মিসেস পারসন্সের অবয়বে, উশকো খুশকো চুলে ছাতরা পড়া একটি মুখ, পাইপে পূতিগন্ধময় আবর্জনা আটকে যাওয়ার পর যাতে মেখে আছে অসহায়ত্বের ছাপ।

আবারও নুয়ে পড়ে গোড়ালির দিকটা চুলকে নিলো সে। দিবারাত্রি টেলিস্ক্রিনগুলো পরিসংখ্যানের তোড়ে আপনার কানে ব্যাথা ধরে যাবে। যেনো প্রমাণ করেই ছাড়বে জনগণ এখন বেশি খাদ্য পাচ্ছে, বস্ত্র পাচ্ছে, আবাসন পাচ্ছে, অধিকতর বিনোদন পাচ্ছে- পঞ্চাশ বছর আগের মানুষের চেয়ে তারা বেশি বাঁচে, কম খাটে, গায়ে-গতরে বড়, স্বাস্থ্যবান, শক্তিধর, আরও খুশি, আরও বুদ্ধিমান, আরও শিক্ষিত। এসব কথার একটি শব্দকণাও কখনো প্রমাণ করা যাবে না, আবার অপ্রমাণও করা যাবে না। ধরুন, দল দাবি করছে, বয়ষ্ক প্রোলদের ৪০ শতাংশ শিক্ষিত: বিপ্লবের আগে বলা হতো এর সংখ্যা ছিলো মাত্র ১৫ শতাংশ। দল দাবি করছে শিশু মৃত্যুর হার এখন হাজারে ১৬০, অথচ বিপ্লবের আগে এর সংখ্যা ছিলো ৩০০- এরকমই অন্য সব পরিসংখ্যান। এটা যেনো দুই অজানা তথ্যকে এক সমীকরণে মেলানো। খুব হতে পারে, এই ইতিহাসের বইয়ের প্রতিটি শব্দ, এমনকি যা কিছু প্রশ্নাতীতভাবে গৃহীত তাও খাঁটি অলিক কল্পনা বৈ কিছু নয়। এমনও হতে পারে, জাস প্রাইমি নকটিস বলে কোনও আইন ছিলো না, পুঁজিপতি বলে কোনও সৃষ্টির অস্তিুত্ব ছিলো না, ছিলো না টপ হ্যাট নামের কোনও পোশাকও।

সবকিছুই ধোয়াশায় মিশে গেছে। অতীত মুছে ফেলা হয়েছে, যার ঘঁষে ফেলা অংশটিও এখন বিস্মৃত, মিথ্যাটাই আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। গোটা জীবনে মাত্র একটিবার- মিথ্যায়নের সুনির্দিষ্ট, অভ্রান্ত নজীর তার হাতে পড়েছিলো। মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড ওটি আঙুলের ফাঁকে আটকে ধরেও রেখেছিলো সে। সালটা ১৯৭৩ই হবে- ততদিনে ক্যাথরিনের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তবে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারিখটি বিচ্ছেদেরও সাত বা আট বছর আগের।

গল্পের শুরু ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে, মহাশুদ্ধিকরণের সেই দিনগুলোতে বিপ্লবের মূল হোতাদের যখন একবারে এবং চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছিলো তখন। ১৯৭০ এর পর এদের একজনেরও অস্তিত্ব থাকলো না, বিগ ব্রাদার ছাড়া। বাদবাকিরা ততদিনে হয় উবে গেছে নয়তো ষড়যন্ত্রকারী, প্রতিবিপ্লবীর তকমা নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গোল্ডস্টেইনও পালালো, আর কোথায় সে গা-ঢাকা দিলো তা কেউ জানে না। অন্যদের মধ্যে কেউ কেউ স্রেফ গুম হয়ে গেলো, আর অধিকাংশেরই বিস্ময়কর গণবিচারে অপরাধের স্বীকারোক্তির পর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে গেলো।

শেষ যারা টিকে ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন তিনজন- জোন্স, অ্যারোনসন আর রাদারফোর্ড। ১৯৬৫ সাল নাগাদ এই তিনজনকে গ্রেফতার করা হলো। যেমনটা প্রায়শঃই ঘটে, এদের তিনজনকেই বছর খানেক বা তারও বেশি সময় ধরে লাপাত্তা করে দেওয়া হলো, যাতে কেউ বুঝতে না পারে ওরা বেঁচে আছেন, নাকি মৃত। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে হঠাৎই একদিন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে আবারও সামনে আনা হলো তাদের।

তিন জনই স্বীকার করলেন, তারা শক্রপক্ষের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করেছেন (সে সময়ও ইউরেশিয়াই ছিলো শত্রুপক্ষ), সরকারের তহবিল তসরুপ করেছেন, দলের কয়েকজন আস্থাভাজন সদস্যকে হত্যা করেছেন, বিগ ব্রাদারের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন আর তা শুরু হয় বিপ্লব শুরুরও অনেক আগে, এছাড়াও তারা জড়িত ছিলেন এমন এক নাশকতায় যার ফলে মৃত্যু হয়েছে কয়েক লাখ মানুষের। এতসব কিছু স্বীকার করে নেওয়ার পরেও তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হলো, দলে ফিরিয়ে নেওয়া হলো, পদে বসানো হলো, যেসব পদ স্রেফ অনারারি, দায়িত্বহীন। তিন জনই ‘দ্য টাইমস’এ লম্বা ফিরিস্তিমূলক ফালতু নিবন্ধ লিখলেন যাতে বর্ণিত হলো তাদের পদস্খলনের কারণ আর সংশোধিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি।

ওদের ছেড়ে দেওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই একদিন এই তিনজনকে চেস্টনাট ট্রি ক্যাফেতে দেখতে পায় উইনস্টন। তার মনে পড়ে, চোখের কৌনিক দৃষ্টি ফেলে কি ভীতিকর আগ্রহ নিয়ে সে তাদের দেখেছিলো। ওরা তার চেয়ে অনেক বয়ষ্ক, যেন প্রাচীন বিশ্বের ভগ্নাবশেষ, দলের সেই গৌরবময় সাহসী দিনগুলোর টিকে থাকা শেষ ক’টি মানুষ। গোপণ সংগ্রাম আর গৃহযুদ্ধের জ্বলজ্বলে স্মৃতি এখনও তাদের চোখেমুখে হালকা হয়ে মেখে আছে। তার মনে পড়ছিলো, যদিও ততদিনে তারিখ আর ঘটনাগুলো আবছা হয়ে এসেছে, বিগ ব্রাদারের নাম জানার অনেক আগেই সে জেনেছিলো এই মানুষগুলোর নাম। কিন্তু মাত্র একটি কিংবা দুটি বছরের মধ্যেই এরা হয়ে গেলো নিষিদ্ধঘোষিত, শক্রপক্ষ, অচ্ছ্যুত, দণ্ডপ্রাপ্ত, নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী। থট পুলিশের হাতে পড়ে শেষ পর্যন্ত রেহাই পেয়েছে এমন একজনও পাওয়া যাবে না। এরা আসলেই কয়েকটি মৃতদেহ যাদের ভাগাড়ে পাঠানোর অপেক্ষা মাত্র।

ওদের কাছাকাছি টেবিলগুলোতে কেউ বসেনি। এ ধরনের মানুষের আশেপাশেও ঘেঁষাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। লবঙ্গের সুঘ্রাণ মিশ্রিত জিন এই ক্যাফের বিশেষত্ব, তারই ঘ্রাণ ছড়ানো গ্লাস সামনে নিয়ে নিঃশব্দে বসেছিলেন তারা। তিন জনের মধ্যে রাদারফোর্ডের চেহারা বেশি আকৃষ্ট করে উইনস্টনকে। একসময়ের বিখ্যাত ব্যাঙ্গচিত্র আঁকিয়ে, যার দুর্দান্ত কার্টুনগুলো বিপ্লবপূর্ব ও বিপ্লবকালীন বিষ্ফোরিত জনমত গঠনে বড় ভূমিকা রেখেছিলো। এখনও দীর্ঘ বিরতিতে তার কার্টুন দ্য টাইমসে আসে। তবে সেগুলো পুরোই ফাঁকিবাজি, স্পন্দন নেই, নেই প্রভাবিত হওয়ার মতো কিছু। পুরোনো বিষয়গুলোরই চর্বিত চর্বন-বস্তিবাসী, ক্ষুধার্ত শিশু, সড়ক সংঘর্ষ, আর চোঙা হ্যাটের পুঁজিপতি- বাধার মধ্যে থেকেই পুঁজিপতিরা এখনো তাদের চোঙা হ্যাটে পেছনের দিনে ফিরে যাওয়ার অবিরাম, অবুঝ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিপুল বপু, তেলজবজবে ধুসর কোকঁড়ানো চুল, বলিরেখা ভরা ঝুলে-পড়া চামড়ার মুখ, নিগ্রোগের মতো মোটা ঠোঁট রাদারফোর্ডের। একসময় তার শরীর যে ভীষণ শক্তি ধরতো তা বোঝা যায়, কিন্তু এখন তার সেই বড়

বপুখানা ঝুঁকে-নুয়ে পড়েছে, ভেঙ্গে-ভেঙ্গে পড়ছে সবদিক থেকে।
পাহাড় যেমন ধসে যায় তেমনি মানুষের চোখে ধসে পড়েছেন তিনি।

বেলা তখন তিনটা, একাকীত্বের সময় উইনস্টনের। এখন ঠিক মনে আসছে না, অমন একটি সময়ে কিভাবেই সে চেস্টনাট ট্রি ক্যাফেতে পৌঁছেছিলো। গোটা ক্যাফেই বলতে গেলে ফাঁকা। হালকা একটা সুর-সঙ্গীত টেলিস্ক্রিন থেকে ভেসে আসছিলো। তিন ব্যক্তি এক কোনায় অনেকটা মূর্তির ন্যায় বসে, মুখে রা নেই কারো। কিছু বলার আগেই আরেক প্রস্থ জিন দিয়ে গেলো ওয়েটার। টেবিলের একপাশে একটা দাবার বোর্ড, গুটি সাজানো আছে, খেলা শুরুর অপেক্ষা। টেলিস্ক্রিনের সঙ্গীত পাল্টে গেলো। শুরু হলো নতুন বাজনা- অদ্ভুত, ভাঙ্গা, কর্কশ এলোমেলো স্বর। উইনস্টন মনে মনে এর নাম দিয়েছে হলুদ স্বর। টেলিস্ক্রিন থেকে ভেসে আসা কণ্ঠ গাইছে:

ছড়িয়ে পড়া চেস্টনাট গাছের ছায়ায় আমি তোমাকে বেচলাম, তুমি বেচলে আমায় হেথায় শুয়ে তারা, আর আমরা এখানে ছড়িয়ে পড়া চেস্টনাট গাছের ছায়ায়…

তিন জনের মধ্যে নড়াচড়াটুকুও নেই। উইনস্টন আরেকবার যখন রাদারফোর্ডের বিপর্যস্ত চেহারায় চোখ ফেললো, দেখতে পেলো চোখ দুটি পানিতে ভরে উঠেছে। আর প্রথমবারের মতোই তার নজরে এলো অ্যারনসন ও রাদারফোর্ড দুজনেরই নাক ভাঙা। চোখে পড়তেই মনের ভেতরটা গুমড়ে উঠলো। অবশ্য আজও সে জানেনা কেনোই তার মনের ভেতরটা গুমড়ে উঠেছিলো।

কিছুদিনের মধ্যে তিনজনকেই গ্রেপ্তার করা হলো। দেখানো হলো, মুক্তির পর থেকেই এরা তিনজন নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দ্বিতীয় বিচারে তারা আরেকদফা পুরোনো সকল অপরাধ স্বীকার করলো, সঙ্গে নতুন অপরাধগুলোও পুরোপুরি মেনে নিলো। তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে গেলো, আর তাদের এই করুণ পরিণতি পার্টির ইতিহাসে নথিভুক্তও হলো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে।

এর প্রায় পাঁচ বছর পর, ১৯৭৩ সাল, নিউমেটিক টিউব থেকে মাত্র বের করে এনে টেবিলে রাখা এক গাদা নথি থেকে একেকটির প্যাঁচ খুলে খুলে দেখছিলো উইনস্টন। তার মধ্যেই সে পেয়ে গেলো একটি কাগজ যা অন্যগুলোর মধ্যে ভুলে ঢুকে পড়েছে। খুলেই সে এর গুরুত্ব ধরে ফেললো। এটি ছিলো দ্য টাইমসের বছর দশেক আগের একটি সংখ্যার ছেঁড়া আধখানা পাতা। পাতার উপরের আধা অংশ, ফলে তারিখটিও রয়েছে স্পষ্ট। পত্রিকার সেই পাতায় পার্টির একটি প্রতিনিধি দলের নিউ ইয়র্ক সফরে গিয়ে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার খবর একটি বড় ছবিসহ। ছবির

মাঝখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উপস্থাপিত তিনজন- জোন্স, অ্যারনসন আর রাদারফোর্ড। ভুল হওয়ার কোনও কারণ নেই, আর নিচে ক্যাপশনেও লেখা ছিলো তাদেরই নাম।

এখন কথা হচ্ছে, দু’দফা বিচারেই এরা তিন জন স্বীকারোক্তিতে বলেছেন, ওই দিনটিতে তারা ইউরেশিয়ায় অবস্থান করছিলেন। কানাডার একটি গোপন বিমানঘাঁটি থেকে উড়ে গিয়েছিলেন সাইবেরিয়ায়। সেখানে ইউরেশীয় জেনারেল স্টাফের সদস্যদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করে তারা তুলে দিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক গোপন তথ্য। উইনস্টনের কাছে তারিখটি ধরা পড়লো কারণ ওটি ছিলো মধ্য গ্রীস্মের একটি দিন। পুরো গল্পটি অবশ্যই আরও অসংখ্য স্থানে একইভাবে রচিত হয়ে আছে। এ থেকে বলাই যায়- এরা মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন।

অবশ্যই এটা নতুন কোনও আবিষ্কার নয়। শুদ্ধি অভিযানে বিলীন হয়ে যাওয়া মানুষগুলো যেসব অপরাধে অভিযুক্ত, সত্যিকারে সে অপরাধগুলো তারা করতো বলে উইনস্টন কল্পনায়ও মনে করতো না। কিন্তু এ ছিলো এক সুনির্দিষ্ট প্রমাণ, ছিলো মুছে ফেলা অতীতের বেঁচে যাওয়া একটি স্মৃতি, যেভাবে জীবাষ্মের কোনো হাড় ভুল স্তরে পড়ে টিকে গিয়ে ভূ-তত্ত্বের মূল তত্ত্বকেই হুমকিতে ফেলে দেয় কখনো, ঠিক তেমনি। এই একটি নথি পার্টিকে অণুতে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, যদি কোনভাবে বিশ্বের দরবারে এটি প্রকাশ করা যায় আর এর গুরুত্ব তুলে ধরা যায়, তবেই।

সোজা কাজে মন দিলো উইনস্টন। ছবিটি দেখে এর গুরুত্ব বুঝে ফেলার পর দ্রুতই আরেকটি কাগজ দিয়ে ওটি ঢেকে ফেললো। ভাগ্য ভালো বলা চলে, কাগজটি যখন খুলছিলো তখন টেলিস্ক্রিনের চোখে ছিলো এর উল্টো দিকটা।

লেখার প্যাড হাঁটুর উপর রেখে চেয়ারটি ধাক্কা দিয়ে পেছনে সরিয়ে নিলো উইনস্টন। টেলিস্ক্রিনের চোখ থেকে নিজেকে যতটা বাঁচানো যায়। চেহারা অভিব্যক্তিশূন্য করে রাখা এমন কিছু কঠিন নয়, এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসও নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়; কিন্তু হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়; আর টেলিস্ক্রিন এতটাই সুক্ষ্ম যে ওই স্পন্দনটিও ধরে ফেলে। তার বিচারে এভাবেই কাটলো দশ মিনিট, যন্ত্রণাদায়ক একটি ভয় ভর করে থাকলো মনের ভিতর- যেনো তাকে প্রতারিত করে, আচমকা বাতাসের ঝাপটায় ডেস্ক থেকে সব উড়ে যাবে। এরপর, ঢাকা থাকা অবস্থাতেই তুলে নিয়ে আরও কিছু অকেজো কাগজের সঙ্গে ছবিটি স্মৃতি গহ্বরে ফেলে দিলো। আর সম্ভবত এক মিনিটের মধ্যেই তা ভষ্মে পরিণত হলো।

এ ঘটনা দশ-এগারো বছর আগের। এখনকার হলে, হতে পারতো, ছবিটি রেখেই দিতো উইনস্টন। তবে হাতের আঙুলে ক্ষণকাল চেপে ধরে রাখা সেই সত্য

তার কাছে এখনও ভিন্ন কিছু অর্থ দেয়, যদিও সেই ছবি আর সে ছবিতে নথিভুক্ত ঘটনা দুইই আজ স্মৃতি। তার সন্দেহ জাগে, অতীতের ওপর কি তাহলে দলের দখল কম, যে দলিল আজ নেই, এক সময়তো তা অবশ্যই ছিলো।

কিন্তু আজ, ধরা যাক ছাই থেকেই ছবিটি ফের আসল চেহারা পেলো তাতেই কি একটি বড় প্রমাণ হয়ে যাবে। সে যখন এটি আবিষ্কার করে ততদিনে ওশেনিয়ার সঙ্গে ইউরেশিয়ার যুদ্ধ সাঙ্গ হয়ে গেছে, তখন পূর্ব এশিয়ার এজেন্টদের কাছে এর ব্যাখ্যা এই হতো, তিনটি মৃত ব্যক্তি তাদের দেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

এরপর পরিস্থিতি বার বার পাল্টেছে- দুই বার, তিন বার, সে জানেনা কতবার! হতে পারে স্বীকারোক্তি পুনর্লিখনের পর পুনর্লিখন হয়েছে, যতক্ষণ মূল ঘটনা ও তারিখ তার সামান্য গুরুত্বটুকুও হারিয়ে না ফেলেছে ততক্ষণ, ততবার লেখা হয়েছে। অতীত কেবল পাল্টেই দেওয়া হয়নি, বার বার পাল্টানো হয়েছে। মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে যা তাকে সবচেয়ে বিপর্যস্ত করে রাখে তা হচ্ছে সে কোনও দিন স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না, কেনো ছলচাতুরির এই বিশাল যজ্ঞ। অতীত মিথ্যায়নের আপাত সুবিধা আছে, কিন্তু এর মূল অভিসন্ধী রহস্যে ভরা। ফের কলম তুলে নিলো সে, লিখলো:

আমি বুঝি কিভাবে; কিন্তু বুঝিই না কেনো।

সে নিজেই কি আসলে একটা পাগল? এই ভেবে তার ভয় হয়। অতীতেও বার বার হয়েছে। একজন পাগল স্রেফ একা। একটা সময় ছিলো, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এমন কথায় বিশ্বাস করাই ছিলো পাগলামি; এখন অতীত পাল্টানো যায় না, সে কথায় বিশ্বাস করা পাগলামি। হতে পারে সে একাই সেই বিশ্বাস ধারণ করে, আর যদি একাই হয়, তাহলে তো সে পাগলই। তবে এই পাগল হওয়ার ভাবনা তাকে খুব একটা ঝামেলায় রাখে না, বরং তার এই ভাবনা যদি ভুল হয়ে বসে সেই ভয়টিই বড় আতঙ্কের বিষয় হয়ে ওঠে!

শিশুদের ইতিহাস বইটি তুলে নিয়ে এর মুখচিত্রে ছাপা বিগ ব্রাদারের ছবিটির দিকে তাকালো সে। সম্মোহনী চোখ দুটো তার চোখের গভীরে প্রোথিত। মনে হবে কিছু একটা কঠিন চাপ সৃষ্টি করে খুলির ভেতরে ঢুকে পড়ছে, মস্তিষ্কে আঘাত হানছে, বিশ্বাসগুলো থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছে, আর প্রায় এমন কাবু করে ফেলছে যেনো আপনি আপনার নিচের চেতনাকেও অস্বীকার করে বসেন। এরপর পার্টি একদিন ঘোষণা করে দেবে- দুই আর দুইয়ে পাঁচ হয়, আর আপনি তাই বিশ্বাস করবেন। এটা অবশ্যম্ভাবী, অতি শীঘ্র, নয়তো আরও পরে পার্টি একদিন এমন দাবিই করবে, তাদের অবস্থান থেকে এটাই হবে যৌক্তিক দাবি। অভিজ্ঞতার শক্তিই কেবল নয়, বিদ্যমান বাহ্যিক বাস্তবতাগুলোও কৌশলে তাদের

দর্শণ দিয়ে অস্বীকার করা হচ্ছে। সকল নব্যতন্ত্রের সেরা তন্ত্র সাধারণ জ্ঞান। ভিন্নচিন্তার জন্য আপনাকে যে ওরা হত্যা করে সেটা ভয়ঙ্কর নয়, ভয়ঙ্কর হচ্ছে ওরা যা করে সেটাই ওরা সঠিক বলে জ্ঞান করে। তাহলে আমরা কিভাবেই জানবো, দুই আর দুইয়ে চার হয়? অথবা মধ্যাকর্ষণের শক্তি কিভাবে কাজ করে? অথবা অতীত পাল্টানো যায় না? যদি অতীত আর বাহ্যিক পৃথিবী দুইয়েরই অস্তিত্ব থাকে কেবল মনে, আর সে মনটা যদি হয় নিয়ন্ত্রিত, তাহলে কী করেই বা তা হবে?

কিন্তু না! তার সাহসিকতা হঠাৎ করেই যেনো নিজের মতো করে জোর পায়। কোন যোগসূত্র ছাড়াই তার মনে ভেসে উঠলো ও’ব্রায়েনের মুখ। অতীতের চেয়ে অনেক বেশি নিশ্চয়তায় সে জানে, ও’ব্রায়েন তার পক্ষের কেউ নন। সে এই ডায়রি লিখছে ও’ব্রায়েনের জন্য- ও’ব্রায়েনের কাছে: এ যেনো অসমাপনীয় একটি চিঠি যা কেউ পড়বে না; কিন্তু তা এক বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে লেখা এবং সেই সত্য থেকেই এর রং নেওয়া।

পার্টি বলে দিয়েছে যে কোনও দলিল চোখে দেখে বা কানে শুনে ভুলে যেতে হবে। এটিই তাদের চূড়ান্ত ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ। তার হৃদয়টি যেনো তলিয়ে যায় যখন সে ভাবে কি ভয়ানক ক্ষমতার দাপটে সে কুক্ষিগত হয়ে আছে, কত সহজে পার্টির কোনো বুদ্ধিজীবী তাকে বিতর্কের মাঝে ছুঁড়ে দিতে পারে, ধোঁয়াটে যুক্তি খাড়া করতে পারে যার উত্তর দেওয়া দূরে থাক, অর্থই সে বুঝতে পারবে না। তার পরেও সত্যেই তার অবস্থান! ওরাই ভুল, সেই সঠিক। ষ্পষ্টতই যা প্রতীয়মান, যা ফালতু, যা সত্য তা সুরক্ষিত হবে। স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলো সত্য হবে! মাটির পৃথিবী বিদ্যমান, এর আইন পাল্টায় না। পাথর শক্ত, পানি ভেজা, উপর থেকে ফেললে কোনো বস্তু নিচেই পড়বে। ও’ব্রায়েনকে উদ্দেশ্য করেই যেনো কথাগুলো বলছে, এবং সে যেনো কোন স্বঃতসিদ্ধ বিষয় সামনে নিয়ে আসছে এমন একটি অনুভূতি নিয়ে সে লিখলো:

স্বাধীনতা হচ্ছে, দুইয়ে দুইয়ে চার হয়, এই কথাটুকু বলতে পারা। এটুকু স্বাধীনতা যদি মেলে, বাকি সবই মিলবে।

অষ্টম অধ্যায়

পথের নিচে কোথাও থেকে কফির পোড়া গন্ধ এসে সড়কময় ছড়িয়ে পড়েছে। ভিক্টরি কফি নয়, প্রকৃতপক্ষে কফি বলতে যা বোঝায়, তা-ই! অজান্তেই থমকালো উইনস্টন। দুই সেকেন্ডের মতো হবে, এরই মধ্যে সে শৈশবের বিস্মৃতপ্রায় সেই জগতটিতে ফিরে গেলো। আর ঠিক তখুনি এখানে কাছে-ধারে কোথাও সপাটে দরজা লাগানোর একটা শব্দে কফির গন্ধটা কেটে গেলো। যেনো গন্ধটাও ছিলো ঠিক শব্দের মতো ইথারের কম্পন।

ফুটপাত দিয়ে কয়েক কিলোমিটার হেঁটেছে সে। পায়ের ঘায়ের অংশে তখন ব্যাথায় টনটন করছে। গত তিন সপ্তাহে কমিউনিটি সেন্টারে সান্ধ্যকালীন কর্মসূচিতে এটি তার দ্বিতীয় অনুপস্থিতি। স্রেফ অপরিনামদর্শীরাই এমনটা করতে পারে। কারণ হাজিরার বিষয়ে সতর্ক নজরদারি চলে। নীতিগতভাবেই পার্টির সদস্যদের জন্য বাড়তি সময় বলে কিছু নেই। বিছানায় কাটানোর সময়টুকু ছাড়া অন্য কোনও সময়ই একা হয়ে যাওয়ার সুযোগ রাখা হয়নি। কাজ, খাওয়া আর ঘুমের বাইরে সাধারণ কিছু বিনোদনমূলক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া চলবে। একাকীত্বের আভাস দেয় এমন কিছু করা, এমনকি একা একা হেঁটে যাওয়াও কিছুটা বিপদের। নিউস্পিকে একটা শব্দ আছে ‘ওউনলাইফ’- যার এরা মানে দিয়েছে খামখেয়ালিপনা। কিন্তু আজ বিকেলে মন্ত্রণালয় থেকে বের হয়ে এলে এপ্রিলে মৃদুমন্দ বাতাস তাকে আহ্বান জানালো। আকাশটাকে এতটা উষ্ণনীল এবছর আর একদিনও দেখা যায়নি। তার মনে এলো কমিউনিটি সেন্টারে শোরগোলে সন্ধ্যার দৃশ্য, ঘর্মাক্ত হয়ে ঘিনঘিনে পরিবেশ চলবে খেলা, বকবকানি, ভাষণ, জিনের মদিরায় তেলতেলে সৌহার্দ্যতার ক্যাচক্যাচানি, এসবই অসহ্য ঠেকে তার কাছে। ভাবাবেগে আপ্লুত সে বাস-স্টপের উল্টোপথ ধরলো, পা বাড়ালোর গোলক ধাঁধার লন্ডন নগরীর পথে। প্রথমে দক্ষিণে সেখান থেকে পূবে এরপর আবারও উত্তরে। অজানা- অচেনা সড়কগুলোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, পথ কোন দিকে যাচ্ছে, কোথায় গন্তব্য তা নিয়ে এতটুকু না ভেবে স্রেফ ঘুরে বেড়ালো।

‘আশা যদি কিছু থাকে,’ ডায়রিতে লিখেছিলো সে, ‘তা ওই প্রোলদের মধ্যেই প্রোথিত’, রহস্যাবৃত সত্য আর স্পষ্ট বোধগম্য অযৌক্তিকতা নিয়ে সে কথাগুলোই বার বার তার মনের মাঝে ফিরে ফিরে আসছিলো। তখন সে উত্তর-পূর্বদিকের একটা ধূসর-রঙা বস্তিতে। এক সময় এখানেই ছিলো সেন্ট প্যানক্র্যাস স্টেশন। কুচি পাথর বিছানো একটি সড়ক ধরে হাঁটছিলো। দুপাশে সারি সারি দ্বি-তল বাড়ি, ফুটপাত লাগোয়া ভাঙাচোরা দরজাপথগুলো ইঁদুরের গর্তসদৃশ। এখানে সেখানে নোংরা ঘিনঘিনে কাদাপানি, পাথরগুলোও কাদায় জড়ানো। সবগুলো দরজাপথই অন্ধকার, নিচে সরু গলিপথ থেকেও দুই দিকে ছড়িয়ে শাখাপথ। বিষ্ময়কর সংখ্যায় মানুষের গিজগিজ- শরীরে যৌবন ফুটিয়ে তুলে গাঢ় লিপস্টিক মাখা মেয়েদের ঘোরাঘুরি, তাদের সঙ্গে তরুণ-যুবকদের ঘেঁষাঘেঁষি, রূপ আর যৌবন উপচে দিয়ে নারীরা হেলেদুলে যেনো দেখাচ্ছে- নারীতো এমনই, বুড়ো হাবড়ারা চওড়া পা ফেলে এদিক সেদিক ঘুরছে, নোংরা নগ্নগায়ের শিশুরা কাদায় খেলছে, আর তাদের মায়েদের ক্রুদ্ধ চিৎকারে শিউরে শিউরে উঠছে। বাড়িগুলোর এক-চতূর্থাংশেরই জানালা ভাঙা, তাতে বোর্ড লাগানো।

একটা অসহায়ত্বের বোধ যেনো গেড়ে বসলো উইনস্টনের মধ্যে। এই বুড়োর স্মৃতিতেতো ফালতু কিছু নোংরামি দুষ্টুমির ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নেই! গোটাদিন প্রশ্ন করলেও তার পেট থেকে প্রকৃতচিত্র কিছু

কেউ বের করে আনা সম্ভব নয়। তাহলে কি পার্টির ইতিহাসবেত্তারাই সত্যি লিখেছেন। হতে পারে তারাই পুরোপুরি সত্য। এসব ভাবতে ভাবতে একটা শেষ চেষ্টা চালালো সে।

‘আমি বোধ হয় তোমাকে ঠিক বুঝাতে পারিনি,’ বললো সে। আমি বলতে চাইছি
– বয়সতো তোমার ম্যালাই হলো; জীবনের অর্ধেকটা তোমার কেটেছে বিপ্লবের আগে। ১৯২৫ সালের কথাই ধরো, ততদিনে তুমিতো বেশ বড়ই হয়ে উঠেছিলে। তো যতটা স্মরণ করতে পারো তার ওপর ভর করেই বলো- ১৯২৫ সালের সেই জীবন কি এখনকার জীবনের চেয়ে ভালো কিছু ছিলো? তোমাকে যদি পছন্দ করতে বলা হয়, তুমি কোন জীবনটি বেছে নেবে, তখনের নাকি এখনের?’

বাণখেলার বোর্ডের দিকে একটা ধ্যানগ্রস্ত চাহুনি ফেলে রেখেছে বুড়োটি। এবার বিয়ারের গ্লাস তুলে এক চুমুকে পুরোটা খালি করে দিলো। তবে আগের চেয়ে একটু ধীর ধীরে। বলতে শুরু করলো। বিয়ারে নেশা তাকে ধরেছে ঠিকই, তবে কথাবলার ভঙ্গিতে দার্শনিকতার ছাপটা তখনও রয়ে গেছে।

‘আমি জানি তুমি ঠিক কি শুনতে চাইছো,’ বললো সে। ‘তুমি চাইছো আমি বলি, আমি যৌবনে ফিরে যেতে চাই। অনেক মানুষই বলে, তারা যৌবনে ফিরতে চায়। যৌবনে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকে, শক্তি-সামর্থ থাকে। আমার মতো বয়স যখন হবে তখন তুমিও সুস্থ থাকবে না। আমার কথাই ধরো, এখন পায়ের ব্যথায় ভুগছি, মুত্রথলির দশা যাচ্ছেতাই। রাতে গড়ে ছয়- সাতবার বিছানা থেকে উঠতে হয়। তবে বুড়ো হওয়ার কিছু সুবিধাজনক দিকও আছে বলে রাখি। উদ্বেগের কারণগুলিই হবে ভিন্ন কিছু। নারীর সান্নিধ্য নেই, সেটাও একটা ভালো দিক। আমি তো গত প্রায় ত্রিশ বছর কোনও নারীর সঙ্গে শুইনি। আশা করি বিষয়টা তোমার ভালো লাগছে। আর এসবই তো শুনতে চাও, না- কি?’

জানালার শার্সিতে ঠেস দিয়ে বসলো উইনস্টন। আর কথা চালিয়ে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। তবে বিয়ারতো খাওয়াই যায়। এই ভাবনা থেকে ঠিক যখন ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখনই দ্রুত গতিতে বুড়ো ছুটলো কামরার পাশের প্রশ্রাবখানার দিকে। অতিরিক্ত আধা লিটার এরই মধ্যে তার ওপর ক্রিয়া করতে শুরু করেছে। নিজের খালি গ্লাসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে এক কিংবা দুই মিনিট তাকিয়ে থাকলো উইনস্টন, এরপর সম্বিত যখন ফিরলো তখন নিজেকে সে আবিস্কার করলো সড়কে। উইনস্টনের মনে হলো, বড়জোর বিশ বছর, এই সময়ের মধ্যে এই যে ‘এখনকার জীবন অতীতের চেয়ে ভালো কি মন্দ ছিলো?’ এমন প্রশ্নটিও উবে যাবে। এর আর উত্তরও যেমন থাকবে না, প্রশ্নটিও অস্তিত্ব হারাবে। আর এখনই কি এর উত্তর মিলছে? যেখানে অতীতের টিকে থাকা গুটিকয় মানুষ বুঝতেই পারছে না তাদের নিজেদেরই অতীত ভালো ছিলো, নাকি বর্তমানটি ভালো।

তারা লাখো অপ্রয়োজনীয় ফালতু বিষয় মনে রাখে, সহকর্মীর সঙ্গে একবার যে বচসা বেঁধেছিলো সে কথা, একবার বাইসাইকেলের হাওয়া চলে গেলে কি কষ্টই না হয়েছিলো, বহু আগে মরে যাওয়া বোনটির চেহারার অভিব্যক্তি, সত্তুর বছর আগে কোনও এক সকালে ঘূর্ণিবাতাসে ধুলোদের উড়োউড়ি পর্যন্ত তাদের মনে ধরে আছে- কিন্তু প্রয়োজনীয় সব সত্যই তাদের দৃষ্টির বাইরে। এরা স্রেফ পিঁপড়ার মতো, কেবল ছোট ছোট বস্তুই দেখতে পায়, বড় বস্তু এদের চোখে পড়ে না। স্মৃতি যখন ব্যর্থ, আর নথিগুলো মিথ্যায়নে সিদ্ধ- তখন পার্টির তরফ থেকে জীবনমান উন্নয়নের সকল দাবিই ধোপে টিকে যায়, কারণ অতীতের জীবনমানের কোনো তথ্য বা মাপকাঠী কারো জানা নেই যার সঙ্গে বর্তমানের তুলনা চলে।

ঠিক এটা ভাবতে ভাবতেই উইনস্টনের ভাবনার ট্রেন হঠাৎ থামলো। সে থমকালো, আর চোখ তুলে তাকালো। তখন একটা সরু সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলো। অন্ধকারে গোটা কয় দোকান-পাট বাসাবাড়ি গুলোর মাঝেই স্থান করে নিয়েছে। ঠিক তার মাথার উপর ঝুলছিলো তিনটে রংচটা ধাতব বল। দেখে মনে হচ্ছিলো, একসময় এগুলো চকচকেই ছিলো। স্থানটি তার চেনার কথা। অবশ্যই চেনে! সে এখন ঠিক সেই ভাঙারির দোকানের সামনেই দাঁড়িয়ে যেখান থেকে একদা ডায়রিটি কিনেছিলো।

একটি ভয়ার্ত বেদনা তার শরীরের ভেতর দিয়ে শিরশির করে বয়ে গেলো। নোটবুকটি কেনাই ছিলো এক মস্ত অপরাধ। তখনই শপথ করেছিলো এই পথ আর মাড়াবে না। তবে ভাবনাটাকে স্বাধীন করে দিয়ে সে বুঝতে পারলো, বস্তুত সে নয়, তার পদযুগলই তাকে টেনে এনে দাঁড় করিয়েছে এই দোকানের সামনে। ডায়রি লেখা শুরু করেও নিজেকে রক্ষা করা যাবে বলে যে আশাটুকু ছিলো, এইখানে ফের চলে আসা সেই আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্যও যে সর্বনেশে তা তার বুঝতে বাকি নেই। সে দেখলো রাত তখন নয়টা বাজে কিন্তু এই রাতেও দোকানটি খোলা। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়াই হবে কম সন্দেহের হবে এমন একটা ভাবনা থেকে দরজাপথে ভেতরে পা বাড়ালো। কেউ যদি জেরা করে, বলতে পারবে রেজর ব্লেড কেনার জন্যই আসা।

দোকান মালিক একটি ঝুলন্ত তেলের কুপি জ্বালিয়েছে মাত্র। কুপি থেকে অল্প আলো আর মোহময় একটা ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে। ষাটের কোটায় বয়স, দুর্বল, ঝুঁকে পড়া শরীর, লম্বা টিকালো নাক, মৃদু চাহুনি যা চশমার মোটা কাচে বিঘ্নিত। মাথার চুল অনেকটাই পেকে সাদা, তবে ঘন ভ্রু-যুগল এখনো কালো। চশমায়, ভদ্র-শ্লথ নড়াচড়ায়, আর পরনের কালো ভেলভেটের জ্যাকেটে এক ধরনের বুদ্ধিদীপ্তের ছাপ। মনে হবে লোকটি শিক্ষিত, অথবা শিল্পীও ভেবে বসতে পারেন। কণ্ঠ অনুচ্চ গম্ভীর, আর উচ্চারণ অধিকাংশ প্রোলদের চেয়ে আলাদা।

ফুটপাতে তোমাকে দেখেই চিনে ফেলেছি, বললো দোকানি। ‘তুমি তো সেই, সেবার শ্যুভেনির অ্যালবামটি কিনলে। কাগজগুলো খুবই সুন্দর। জানো, বলা হতো ক্রিম-লেপা কাগজ! অমন কাগজ এখন আর তৈরিই হয় না- আমিতো বলবো গত পঞ্চাশ বছরে দেখিনি।’ চশমার কাচের উপর দিয়ে চোখ তুলে উইনস্টনের দিকে তাকালো সে। ‘তোমার বিশেষ কিছু চাই? নাকি স্রেফ দেখার জন্য এলে?’

‘এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, অনিশ্চিতের স্বর উইনস্টনের কণ্ঠে। ‘মনে হলো একটু ভেতরে ঢুকি। বিশেষ কিছু চাই না।’

‘সে ভালো বটে’ বললো দোকানি। ‘আমারও মনে হয় না, তোমার ভালো লাগবে এমন কিছু আছে,’ নরম দুটি করতল ঘষে ঘষে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি তার। ‘দেখতে পাচ্ছো দোকানটার দশা। একেবারে খালি বলতে পারো। তোমাকে একটা কথা বলি, আমার মনে হয় প্রাচীন পণ্যের বাজার শেষ হতে বসেছে। ওগুলোর আর কোনও কদর নেই, চাহিদা নেই আর মজুদও নেই। আসবাব, চিনামাটির তৈজষ এসব ভাঙতে ভাঙতে শেষ, ধাতব পাত্র-পদার্থতো দিনে দিনে উবে গেছে। পিতল-দস্তা আর তামার মিশেলে যে মোমদানি হতো তা কত বছর দেখি না!’

ছোট্ট দোকানের ভেতরটা মালপত্রে ঠাসা। কোনোটিই কমদামি না। মেঝেও ফাঁকা পড়ে নেই, দেয়ালে গাদা গাদা ছবির ফ্রেম ধুলো জমিয়ে ঝুলে আছে। জানালায় পাতা ট্রেতে ছোট ছোট নাট-বোল্টু, ভাঙা বাটালি, হাচড়া-খাচড়া ধাঁরহীন কলম-ছুরি, দমহীন ঘড়ি, যা আর কখনোই সময় দেবে না; এমন আরও নানা ধরনের ভাঙাচোড়া বস্তু-সামগ্রী। এক কোনায় একটি ছোট টেবিলও ভরে আছে নানা সামগ্রীতে- কারুকাজ করা নস্যির কৌটা, আকিক পাথরখচিত কাপড়ের পিনসহ এমন সব জিনিষ যা দেখলেই পছন্দ হবে, মনে হবে দারুণ কিছু।

টেবিলের ওপর গোলাকার একটি বস্তুতে চোখ আটকে গেলো উইনস্টনের। গোল, মসৃণ, বাতির আলোয় হালকা দ্যুতি ছড়াচ্ছে। আলগোছে বস্তুটি হাতে তুলে নিলো সে। কাঁচের তৈরি স্বচ্ছ ভারি একটি বস্তু। এক পীঠ বাঁকানো অন্যদিক সমান, ফলে অনেকটা গোলার্ধের রূপ নিয়েছে। রঙ ও স্বচ্ছতায় মনে হবে বৃষ্টির বড় এক ফোঁটা স্ফটিক জল। ঠিক মাঝখানে অদ্ভুত গোলাপী একটা কিছু কুণ্ডলী পাকিয়ে বসানো। দেখলে গোলাপ কিংবা সামুদ্রিক তারাফুল মনে হবে। বাঁকানো অংশের কারণে উপর থেকে চোখে সেটি বড় হয়ে ধরা দেয়।

‘কি এটা?’ আগ্রহ ভরে জানতে চাইলো উইনস্টন।

‘ওটা কোরাল,’ বললো বুড়ো দোকানি। অবশ্যই ভারত মহাসাগর থেকে এসেছে।
কাঁচের ভেতর বসানো হয়েছে সামুদ্রিক কোরাল। আমার মনে হয় না, এটির বয়স শত বছরের কম হবে, দেখে মনে হচ্ছে তারও বেশি হবে।

‘ভীষণ সুন্দর,’ বললো উইনস্টন।

‘হ্যাঁ, খুব সুন্দর,’ প্রশংসাসূচক উচ্চারণ দোকানির। ‘তবে আজকাল আর এগুলো বেশি পাওয়া যায় না।’ খানিকটা কেশে নিয়ে বুড়ো ফের বললো, ‘এখন তুমি যদি এটা কিনতে চাও, পুরো চার ডলার দাম পড়বে। আমার দিব্যি মনে আছে পুরো আট পাউন্ড দিয়ে কিনেছি। আর আট পাউন্ড মানে হচ্ছে- না ঠিক হিসাব কষতে পারবো না, কিন্তু এটা বুঝি অনেক টাকা। সত্যিকারের প্রাচীন বস্তুতে কারই বা আগ্রহ বলো? হোক না এখন এগুলো খুব কমই মেলে?’

উইনস্টনের মন ধরে গেলো বস্তুটিতে, তাই দ্রুত দোকানির হাতে চার ডলার তুলে দিয়ে বস্তুটি পকেটে পুরে নিলো। এর সৌন্দর্য তার কাছে বড় বিষয় নয় বরং আজকালের বস্তুগুলোর চেয়ে এটি ভিন্ন কিছু, যার মালিকানা পাবার তীব্র বাসনাই বড় আবেদন হয়ে ধরা দিয়েছিলো তার মনে। বৃষ্টির পানির মতো স্বচ্ছ এমন কাঁচের গোলক আর কখনোই সে দেখেনি। আপাত এই প্রয়োজনহীনতাই বস্তুটিকে তার কাছে দ্বিগুণ আকর্ষণের করে তুললো, যদিও সে জানে একদিন হয়তো সে এটি পেপারওয়েট হিসেবেই ব্যবহার করতে শুরু করবে। পকেটে খুব ওজন লাগছিলো, তবে পকেটে বস্তুটি খুব একটা ফুলে উঁচু হয়ে নেই সেটাই বাঁচোয়া। এটি অদ্ভুত একটা বস্তু, একজন পার্টি সদস্যের মালিকানায় থাকাটাও অস্বাভাবিক বলে জ্ঞান করা হয়। ফলে যা কিছু পুরোনো, আর যা কিছু সুন্দর তা-ই সন্দেহের উদ্রেক ঘটায়। পুরো চার ডলার হাতে পেয়ে বুড়োর খুশি মুখটা দেখার মতো হয়ে উঠেছিলো। উইনস্টনের মনে হলো বুড়ো আসলে তিন ডলারে এমনকি দুই ডলারেই বেচতে রাজি হয়ে যেতো।

‘উপরের তলায় আরেকটি কামরা আছে, তুমি চাইলে একবার ঘুরে দেখতে পারো,’ বললো দোকানি। ‘খুব বেশি কিছু নেই, মাত্র কয়েকটা জিনিষ। তুমি যেতে চাইলে বাতি হাতে করে যেতে হবে।’

‘আরেকটা বাতি জ্বালালো বুড়ো, আর ধনুক-বাঁকা পীঠে খাড়া, নড়বড়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে ধীরে ধীরে উপরে উঠলো। পরে সরু একটি পথ গলে তারা যে কামরায় ঢুকলো সেখান থেকে রাস্তা দেখা যায় না, তবে বাইরেটা চোখে পড়ে। পাথর বিছানো আঙিনা আর চোঙা-আকৃতির বড়বড় পাত্র রয়েছে ওদিকটায়। উইনস্টন দেখলো ঘরের ভেতরেও কিছু আসবাবপত্র সাজানো, তাতে মনে কেউ এখানে বসবাস করে। মেঝেতে এক ফালি কার্পেট, দেয়ালে ঝোলানো এক-দুটি ছবি। একটি নিচু নোংরা হাতলওয়ালা চেয়ার ফায়ার প্লেসের সামনে পাতা। পুরোনো ফ্যাশনের বারো ঘণ্টা ডায়ালের একটি

কাঁচের ঘড়ি চুল্লির উপরের দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসা তাকের ওপর বসে টিক টিক করে সময়ের বহমানতা জানান দিচ্ছে। জানালার পাশে কামরার সিকিভাগটা জুড়ে প্রমাণ সাইজের একটা বিছানা পাতা।

‘আমার স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিলো ততদিন আমরা এখানেই থাকতাম,’ আবার ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিমা বুড়োর কথায়। ধীরে ধীরে আসবাবপত্রগুলো বেচে দিচ্ছি। ওই যে বড় মেহগনি কাঠের বিছানাটি দেখছো ওটাই বাকি আছে, ছারপোকা ছাড়াতে পারলে ওটাও বেচবো। তবে বলতে পারি কাজটা ঝামেলারই হবে।’

বাতিটি সামান্য উঁচু করে ধরলো বুড়ো, এতে গোটা কামরা নজরে এলো আর ঠিক তখনই উষ্ণ আলো লুটিয়ে পড়া কামরাটি যেনো তাকে আহ্বান করে বসলো। উইনস্টনের মনে হলো, সপ্তায় গোটা কয় ডলার খরচ করলে এটি ভাড়া নেওয়া যায়। এজন্য কেবল তাকে ঝুঁকি নেওয়ার সাহসটুকুই সঞ্চার করতে হবে। ভয়াবহ এক জংলি ভাবনা, যা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করে দেওয়া উচিত। কিন্তু এই কামরা যে তার ভেতরে এক ধরনের নস্টালজিয়া তৈরি করেছে, পিতৃপুরুষের কোনও এক অজানা স্মৃতি তার মধ্যে জাগ্রত করেছে। তার মনে হলো ঠিক এমনই একটি কক্ষে ফায়ারপ্লেসের পাশে হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছে, চুল্লির ঘেরের ওপর দুটি পা তুলে রাখা, আর কেতলিতে ফুটছে গরম পানি, এমন একটি দৃশ্যকল্প তার অনুভবে ছিলো। যেখানে সে সত্যিকার অর্থেই একা, সত্যিকারেই নিরাপদ, কেউ তার ওপর নজর রাখছে না, কোনো কণ্ঠ নির্দেশ দিয়ে চলছে না, কেবল কেতলির মৃদু ফট ফট আর ঘড়ির প্রিয় টিক টিক ধ্বনি ছাড়া আর কোনও শব্দই কোথাও নেই।

‘কোনো টেলিস্ক্রিন নেই!’ বিস্ময়ের বিড়বিড় উচ্চারণে কথাটি না বলে পারলো না সে।

‘নাহ!,’ বললো বুড়ো, ‘কোন কালেই বস্তুটি আমার ছিলো না। ম্যালা দামি। আর আমার মনেও হয় না এর কোনো প্রয়োজন আছে। কোনায় ওই পা-ভাঁজ করা টেবিলটি দেখেছো। তুমি চাইলে পা ছড়িয়ে বসাতে পারো, ভাঁজ করেও রাখতে পারো।’

অন্য কোনায় একটি ছোট বইয়ের বাক্স, আর উইনস্টনও ততক্ষণে ওটি দেখে এগিয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ময়লার দলা ছাড়া কিছুই নেই। বই খুঁজে খুঁজে তা ধ্বংস করার কাজটি অন্যত্রের মতো একইভাবে প্রোলদের কোয়ার্টারগুলোতেও হয়েছে। ১৯৬০ সালে আগে রচিত কোনও একটি বই ওশেনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তখনও বাতিটি উঁচু করে ধরে, বুড়ো দাঁড়ালো একটি গোলাপকাঠের ফ্রেমে বাঁধা ছবির সামনে। এটি বিছানার ঠিক উল্টোদিকে, ফায়ার প্লেসের অপর পাশে ঝোলানো।

‘এই পুরোনো ছাপায় যদি আদৌ তোমার কোনো আগ্রহ থাকে-’ হেয়ালিপনার উচ্চারণ বুড়োর।

উইনস্টন উল্টোদিকে এগিয়ে গেলো ছবিটি পরীক্ষা করতে। স্টিলে খোদাই করা আয়াতকার জানালা বিশিষ্ট ডিম্বাকৃতির একটি ভবন, সামনে একটি ছোট টাওয়ার। ভবনের চারিদিক রেলিং ঘেরা, আর পেছনের শেষভাগে একটি মূর্তি বসানো। কিছুক্ষণ ধরে ছবিটি দেখলো উইনস্টন। অস্পষ্টভাবে মনে হলো, এমন দৃশ্য সে আগে দেখেছে, তবে ঠিক কবে কোথায় মনে করতে পারছে না।

‘ফ্রেমটি দেয়ালে সেঁটে দেওয়া,’ বললো বুড়ো, ‘তবে বলছি, স্ক্রু খুলে ওটা আমি তোমায় দিতে পারবো না।’

‘ছবির এই ভবনটি আমার চেনা,’ অবশেষে বললো উইনস্টন। ‘এটা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এটি বিচারলয় প্রাসাদের বাইরে সড়কের ঠিক মাঝখানে ছিলো।’

‘ঠিক বলেছো। আদালত ভবনের বাইরে ছিলো। এতে বোমা মারা হয়েছিলো- কত সালে মনে পড়ছে না, তবে অনেক বছর আগে। একসময় এটি ছিলো গির্জা, নাম ছিলো সেইন্ট ক্লেমেন্ট ডেইনস। আবারও ক্ষমাপ্রার্থণার ভঙ্গি তার হাসিতে, যেনো, এমন কিছু বলার সচেতনতাই অপরাধ। তবে যোগ করলো, ‘অরেঞ্জেস অ্যান্ড লেমন্স, সে দ্য বেলস অব সেইন্ট ক্লেমেন্ট’স!’

‘মানে কি?’ প্রশ্ন উইনস্টনের।

‘আরে! “অরেঞ্জেস অ্যান্ড লেমন্স, সে দ্য বেলস অব সেইন্ট ক্লেমেন্ট’স” এটা ছিলো আমাদের ছেলেবেলার একটি ছড়া। কিভাবে এই ছড়া এলো বলতে পারবো না, কিন্তু আমি জানি এখন আর এই ছড়া নেই। “হিয়ার কামস অ্যা ক্যান্ডল টু লাইট ইউ টু বেড, হিয়ার কামস অ্যা চপার টু চপ অফ ইওর হেড।” এটা ছিলো নাচের গান। দুজন হাত বেঁধে উপরে তুলে রাখতো, আর অন্যজন নিচে দিয়ে যেতো। আর যখন তারা “হিয়ার কামস অ্যা চপার টু চপ অফ ইওর হেড” বলতো তখন দ্রুত হাত নামিয়ে আটকে ফেলতো।’

একটা তালিকা দেখিয়ে বললো, ‘এগুলো বিভিন্ন গির্জার নাম। লন্ডনের সব প্রধান প্রধান গির্জার নাম পাবে।’

উইনস্টন দেখছিলো গির্জাটি কোন শতাব্দীর। লন্ডনের ভবনগুলোর বয়স মাপা বরাবরই কঠিন একটা কাজ। কোনটি বড় বা সুন্দর হলে, আর তা দেখতে যদি অপেক্ষাকৃত নতুন মনে হয়, সেটা খুব সহজেই বিপ্লবের সময় নির্মিত বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর যেগুলো সন্দেহাতীত ভাবেই পুরোনো, সেগুলোকে বলে দেওয়া হবে মধ্য যুগের। কেউ স্থাপত্য থেকে

ঠিক ইতিহাসটি আর জানতে পারবে না, বই থেকেই তা জানতে হবে। মূর্তি, ভাস্কর্য, স্মৃতি ফলক, সড়কের নাম- এমন যা কিছু অতীতকে নির্দেশ করতে পারে তা অতি সতর্কতায় প্রক্রিয়াকরণ হয়ে গেছে।

‘এটি যে গির্জা ছিলো তা আমার জানা ছিলো না,’ বললো উইনস্টন।

‘এর অনেকগুলো এখনও আছে, সত্যিই আছে,’ বললো বুড়ো, ‘তবে সেগুলো এখন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাহলেই বোঝো, ছড়া কি আর টিকে থাকবে?

“অরেঞ্জেস অ্যান্ড লেমন্স, সে দ্য বেলস অব সেইন্ট ক্লেমেন্ট’স, “ইউ ও মি থ্রি ফার্দিংস, সে দ্য বেলস অব সেইন্ট মার্টিন’স-”

যদ্দুর মনে করতে পারছি, আমার মনে হয় এমনটাই ছিলো। ফার্দিং হচ্ছে ছোট দস্তার মুদ্রা, এখন যে সেন্ট দেখছো এমনই।’

‘সেইন্ট মার্টিন’স কোথায় ছিলো?’ প্রশ্ন উইনস্টনের।

‘সেইন্ট মার্টিন’স? সেতো এখনো আছে। এটিতো ভিক্টরি স্কয়ারে, পিকচার গ্যালারির পাশে। ওই যে সামনে পিলারগুলো ত্রিকোণাকৃতির, আর অনেক উঁচু একটা সিঁড়ি।’

উইনস্টন জায়গাটি ভালো করেই চেনে। বিভিন্ন ধরণের প্রচারণামূলক বিষয়ের প্রদর্শনী চলে এখানে- রকেট বোমা, ভাসমান দূর্গের মডেল, শত্রুপক্ষের নিষ্ঠুরতা তুলে ধরে তৈরি মোমের মূর্তি ইত্যাদি।

‘বলা হতো- সেইন্ট মার্টিন’স-ইন-দ্য-ফিল্ড,’ বললো বুড়ো, ‘তবে আমি ওই অংশে একটি মাঠের কথাও স্মরণ করতে পারছি না।’

ছবিটি কিনলো না উইনস্টন। কাঁচের পেপারওয়েটের চেয়ে অনেক বেশি অসংগতির বস্তু হবে এটি, আর ফ্রেম থেকে ছাড়িযে না নিলে এটি বাড়িতে বয়ে নিয়ে যাওয়াও হবে অসম্ভব। তবে সে বুড়োর সঙ্গে আরো কিছুটা সময় কাটালো। দোকানের সামনের নাম ফলক থেকে যে কেউ ধরে নেবে বুড়োর নামটি হবে উইকস- কিন্তু তার নাম মূলত চ্যারিংটন। মি. চ্যারিংটনের বয়স তেষট্টি আর এই দোকানের মধ্যেই তার গত ত্রিশ বছরের জীবন। তখন থেকেই জানালার পাশে নাম ফলকে নামটি পাল্টে নেওয়ার কথা তার মনে রয়েছে কিন্তু এপর্যন্ত আর তা করা হয়ে ওঠেনি। যতক্ষণ তাদের কথা চললো ততক্ষণই উইনস্টনের মস্তিষ্ক জুড়ে থাকলো বুড়োর সেই আধাআধি স্মরণ করতে পারা ছড়া। “অরেঞ্জেস অ্যান্ড লেমন্স, সে দ্য বেলস অব সেইন্ট ক্লেমেন্ট’স”, “ইউ ও মি থ্রি ফার্দিংস, সে দ্য বেলস অব সেইন্ট মার্টিন’স”। ব্যাপারটি কৌতুহলের, কিন্তু আপনি যা মনে মনে বলবেন বেলের শব্দে তো অবচেতন মনে সেটাই শুনবেন। হারিয়ে যাওয়া লন্ডনের সেই সব বেল হয়তো

কোনখানে টিকে আছে, লুকিয়ে আর বিস্মৃত হয়ে। কোনও এক ভৌতিক চুড়া থেকে সে যেনো শুনতে পাচ্ছে একের পর এক বেল বেজে চলার শব্দ। তবে যতটা মনে করতে পারে, বাস্তব জীবনে সে কখনোই গির্জার বেল বাজার শব্দ শোনে নি।

চ্যারিংটনের কাছ থেকে এগিয়ে একাই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলো সে, রাস্তায় পা ফেলার আগে বুড়োটি কাছে থাকুক তা চাইছিলো না। এরই মধ্যে সে অবশ্য মনোস্থির করে ফেলেছে, সুবিধাজনক বিরতি দিয়ে, হতে পারে মাস খানেক পরে, আরও একবার এই দোকানে আসার ঝুঁকি সে নেবে। সেন্টারে এক সন্ধ্যার অনুপস্থিতির চেয়ে মনে হয় বিষয়টি বেশি বিপদের হবে না। সবচেয়ে বড় বোকামি কিন্তু ডায়রিটা কেনার পর একই স্থানে আরেকবার যাওয়া, বিশেষ করে দোকানের মালিককে বিশ্বাস করা যায় কিনা তা নিশ্চিত না হয়েই। যাইহোক-!

হ্যাঁ, তার মনে হলে ওখানে সে আবারও যাবে। আবারও সে এখানকার সুন্দর সুন্দর অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনবে। সেইন্ট ক্লেমেন্ট ডেন্স’র ওই খোদাইকরা ছবিটি কিনে ওটি ফ্রেম থেকে ছাড়িয়ে, আলখেল্লার জ্যাকেটের নিচে ঢুকিয়ে তবেই বাসায় নিয়ে যাবে। মি. চ্যারিংটনের স্মৃতি ঘেঁটে বের করে আনবে কবিতার বাকি অংশটুকু। এমনকি উপরের তলার কামরাটি ভাড়া করার যে ক্ষণিকের ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিলো সে ইচ্ছাটিও তার মনে আবার চাড়া দিয়ে উঠলো। এসবের উত্তেজনা প্রায় পাঁচ সেকেন্ড ধরে তাকে বেপরোয়া করে রাখে, অতঃপর সে উদভ্রান্তের মতোই পা ফেলে ফুটপাতে। আর একটি সুর গুনগুন করতে থাকে- অরেঞ্জেস অ্যান্ড লেমন্স, সে দ্য বেলস অব সেইন্ট ক্লেমেন্ট’স, ইউ ও মি থ্রি ফার্দিংস, সে দ্য….

ঠিক তখনই তার হৃদয়খানি বরফহিম হয়ে যায়, আর প্রসাবের প্রচণ্ড বেগ চাপে। নীল ওভারঅল পরা কেউ একজন ফুটপাতে নেমে এসেছে, দশ মিটারও ব্যবধান হবে না দুজনের মাঝখানে। এবারও সেই ফিকশন ডিপার্টমেন্টের মেয়েটি। সেই কালোকেশী। আলো অস্পষ্ট কিন্তু চিনে ফেলতে কষ্ট হয়নি। মেয়েটি সরাসরি একবার তার চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে ফেললো আর ত্রস্ত পায়ে হাঁটতে শুরু করলো, যেনো সে তাকে দেখতেই পায়নি।

ক্ষণকয়েক চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো উইনস্টন। এবার ডানে ঘুরলো আর দ্রুত পায়ে এগুতো থাকলো, একবারও মনে এলো না ভুল দিকে যাচ্ছে সে। ব্যাপারটা একেবারে পাক্কা। মেয়েটি যে তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে, তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকলো না। সে অবশ্যই তাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছে। পার্টির সদস্যরা যেখানে থাকে সেখানে থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে, এই অন্ধকার সড়কে একই সন্ধ্যায় দু’জনেরই এসে পড়ার আর কোনো বিশ্বাসযোগ্য কারণ থাকতে

পারে না। এটাও একটা বড় বিষয়, মেয়েটি কি আসলে থট পুলিশের চর, নাকি নিতান্তই শখের গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত। তবে সে যাইহোক, এতে কদাচই কিছু যায় আসে। সে তাকে নজরে রাখছে, এটাই যথেষ্ট। হতে পারে মেয়েটি তাকে সুঁড়িখানায়ও দেখে ফেলেছে।

একেই বলে কষ্ট করে হেঁটে চলা। কাঁচের পিণ্ডটি প্রতি পদক্ষেপে তার রানের ওপর আঘাত করছে, এতে সে প্রায় মনোস্থির করেই ফেলেছিলো ওটি ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সবচেয়ে অসহনীয় হয়ে দেখা দিলো পেটের ব্যাথা। কয়েক মিনিট তার এও মনে হচ্ছিলো, দ্রুত একবার টয়লেটে ঢুকতে না পারলে সে মরেই যাবে। কিন্তু এই এলাকায় কোনো গণশৌচাগার নেই। পরে অবশ্য পায়খানার বেগ চলে গেছে, তবে রেখে গেছে একটা পেট কচলানো ব্যথা।

ওটি ছিলো একটা চোরা গলি। শেষ মাথায় গিয়ে উইনস্টন থামলো। কয়েক সেকেন্ড ভেবেই পাচ্ছিলো না, কি করবে। এবার উল্টো ঘুরলো আর আবারও হাঁটতে শুরু করলো। ঠিক যখন ঘুরছিলো তখনই তার মনে হলো, মোটে তিন মিনিট আগে মেয়েটি তাকে অতিক্রম করে গেছে, সে যদি একটু দৌড় লাগায় তো ওকে ধরে ফেলতে পারবে। এতে সুবিধা হবে, এই নিরব এলাকায় যতক্ষণ থাকবে সে তার গতিবিধি অনুসরণ করতে পারবে, এরপর একটা পাথর দিয়ে সে তার খুলিটি চুরমার করেও দিতে পারবে। তার পকেটে যে কাঁচের পিণ্ডটি রয়েছে ওটিও এমন একটি কাজের জন্য যথেষ্টই ভারি হবে। তবে পুরো ভাবনাটি দ্রুতই বাতিল করলো সে, কারণ এই মূহূর্তে শারিরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করার চিন্তা করাও তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সে দৌড়াতেও পারবে না, আর একটি ঘুষিও ছুঁড়তে পারবে না। উপরন্তু মেয়েটি যুবতী আর গাট্টাগোট্টা, সেই বরং উল্টো তাকে ঘায়েল করে ফেলবে। তার মাথায় এই চিন্তাও এলো দ্রুত কমিউনিটি সেন্টারে পৌঁছে যাবে, আর বন্ধ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই কাটাবে। তাতে ওই সন্ধ্যার কার্যক্রমের একটা আংশিক ব্যাখা সে দেখাতে পারবে। কিন্তু সেও ছিলো অসম্ভব। ভীষণ এক অবষন্নতা তাকে পেয়ে বসেছে। এখন তার একটাই ইচ্ছা, দ্রুত ঘরে ফিরে যাওয়া আর শান্ত হয়ে আরাম করে বসা।

ফ্ল্যাটে যখন ফিরলো ততক্ষণে রাত দশটা পার হয়ে গেছে। মূল ফটকে অবশ্য আলো বন্ধ করা হয় রাত সাড়ে এগারোটায়। ঘরে ঢুকেই দ্রুত রান্নাঘরে ছুটলো আর দেরি না করে এককাপ পরিমান ভিক্টরি জিন গলায় ঢাললো। ধকল সামলাতে সামলাতে চোরকুঠুরির টেবিলে ফিরলো, ড্রয়ার থেকে ডায়রিটা তুলে নিলো কিন্তু তখনই পাতা খুললো না। টেলিস্ক্রিন থেকে একটা কর্কশ নারী কণ্ঠ তারস্বরে গাইছে দেশপ্রেমের গান। ডায়রির মার্বেল মলাটের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলো সে, আর নারী কণ্ঠটিকে সজ্ঞানতার বাইরে ঠেলে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো।

ওরা আপনার খোঁজে রাতেই আসে। সঠিক কাজটি হচ্ছে, ওরা ধরে ফেলার আগেই আত্মহত্যা করে ফেলা। নিঃসন্দেহে কিছু মানুষ সেটাই করে। এ কারণেই বলা যায়, অনেক গুমের ঘটনা মূলতঃ আত্মহত্যা। তবে নিজেকে হত্যা করার জন্য প্রয়োজন চরম সাহস, বিশেষ করে আপনি যখন এমন বিশ্বে বাস করছেন যেখানে আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা দ্রুত কাজ করে এমন বিষ কেনার সুযোগটিও রাখা হয়নি। ভয় ও বেদনার জৈবিক অকার্যকারিতা নিয়ে বিস্ময়চিত্তে সে ভাবলো, মানবদেহের শাসনটাই এমন যে, ঠিক অতি প্রয়োজনে শরীরটা বেঁকে বসে। একটু দ্রুত উদ্যোগী হলে সে হয়তো কালোকেশী মেয়েটিকে ধরতে পারতো: কিন্তু স্রেফ বিপদের আশঙ্কা তার শরীরকে অবশ করে দেয়। তার মনে হলো, সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়ও মানুষকে বাইরের শত্রুর মোকাবেলা করা না লাগতে পারে, কিন্তু শরীরের ভেতরের শত্রুটির বিরুদ্ধে লড়াই চলে নিরন্তর। ঠিক এখন, জিন পেটে যাওয়ার পরেও পেটের ব্যাথাটি তার ধারাবাহিক চিন্তায় বিঘ্ন ঘটিয়ে চলেছে। বিষয়টি সবসময়ই একরকম, হোক সে বীরত্বের কিংবা বিয়োগান্তের। যুদ্ধের মাঠ, নিপীড়ণ কক্ষ, ডুবন্ত জাহাজে আপনার অব্যাহত লড়াইয়ের বিষয়গুলো মনে আসবে না কারণ তখন শরীর আপনার দখলেই থাকে না। যতক্ষণে ভয়ে অচেতন হয়ে যান নি, অথবা ব্যথায় চিৎকার জুড়ে দেননি ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনটা প্রতি মূহূর্তের এক সংগ্রাম। সে সংগ্রাম ক্ষুধার, ঠাণ্ডার অথবা নিদ্রাহীনতার বিরুদ্ধে। অথবা পাকস্থলীর অম্বল কিংবা দাঁতের ব্যথার বিরুদ্ধে।

ডায়রি খুললো উইনস্টন। কিছু বিষয় লিখে ফেলা জরুরি। টেলিস্ক্রিনের নারী নতুন গান ধরেছে। সে গান তার মস্তিষ্কে কাচের ধারালো স্প্লিন্টারের মতো বিঁধছে। ও’ব্রায়েনকে নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলো সে, যার জন্য, কিংবা যাকে উদ্দেশ্য করেই এই ডায়রি লেখা। কিন্তু ও’ব্রায়েন নয়, তার ভাবনা জুড়ে স্থান করে নিলো, থটপুলিশ। ওরা তাকে ধরে ফেললে কি হবে সেসব বিষয়। ওরা যদি সাথে সাথে মেরে ফেলে তো কোনও কথাই নেই। সে হত্যা হবে আপনার প্রত্যাশার পূরণের মতো কিছু। কিন্তু মৃত্যুর আগে (প্রত্যেকেই জানে কিন্তু কেউ কথা বলে না) দোষ স্বীকার সম্পর্কিত কিছু রুটিন কাজের মধ্য দিয়ে আপনাকে যেতেই হবে- মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়ে চিৎকার করতে করতে ক্ষমাভিক্ষা, প্রহারে প্রহারে হাড়গুলো ভাঙার কড়কড় শব্দ, দাঁত গুঁড়িয়ে দেওয়ার যন্ত্রণা আর মাথায় জমাট বেঁধে থাকা রক্তের উপলব্দি।

শেষ যখন ওই একই প্রাণহানিতে, তাহলে তার আগে কেনো এত কিছু? ওই কটি দিন বা সপ্তাহ জীবন থেকে কেনো বাদ দেওয়া যায় না? সন্দেহে পড়ে কেউ ধরা পড়েনি এমন হয়নি, আর কেউ অপরাধ স্বীকার করে নেয়নি এমনটাও হয়নি। একবার যদি আপনি চিন্তাঅপরাধের জালে পড়ে যান, কোনও এক দিনে সেকারণেই আপনার মৃত্যু অবধারিত। তাহলে যে ভয় কোনও কিছু

পাল্টে দেয় না সে ভয় করাই কেনো, কেনই বা ভবিতব্যের কাছে মাথা ঠোকা?

চিন্তা জগতে ও’ব্রায়েনের ছবি টেনে আনতে এবার কিছুটা সফল সে। ‘এমন কোথাও আমাদের দেখা হবে যেখানে কোনও আঁধার থাকবে না,’ ও’ব্রায়েন বলেছিলো তাকে। সে জানে এর মানে কি, অথবা অন্তত তার মনে বলে, সে জানে। যেখানে কোন আঁধার নেই সে স্থানটি এক কাল্পনিক ভবিষ্যত, যা কেউ কখনোই দেখবে না, তবে দূরদৃষ্টি দিয়ে কেউ কেউ তার রহস্যময়তা উপলব্দি করতে পারবে। টেলিস্ক্রিনের কর্কশ শব্দে ভাবনার ধারাবাহিকতা বার বার কেটে যাচ্ছে। চিন্তার ট্রেন গতি হারাচ্ছে। মুখে একটি সিগারেট চেপে ধরলো সে। অর্ধেক পরিমান তামাক পড়লো জিভের ওপর। ভীষণ তেতো কিন্তু তখনই থুুতু ফেলে ওগুলো ফেলে দেওয়াও কঠিন। এমনই মূহূর্তে তার চিন্তার সমুদ্র থেকে ও’ব্রায়েনকে সরিয়ে দিয়ে সাঁতরে ঢুকে পড়লো বিগ ব্রাদার। দিন কয়েক আগে যা করেছিলো ঠিক তেমনিভাবে পকেট থেকে একটি মুদ্রা বের আনলো সে, আর তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো। মুদ্রার পীঠের মানুষটি যেনো তাকেই দেখছে, গভীর, শান্ত ও সুরক্ষার দৃষ্টিতে: কিন্তু কালো ঘন গোঁফের নিচে কিসের এক চাপা হাসি লুকিয়ে আছে? স্তিমিত হয়ে আসা ঘণ্টাধ্বনির মতো তার কানে বার বার বাজতে থাকলো:

যুদ্ধই শান্তি স্বাধীনতা দাসত্ব অবজ্ঞাই শক্তি।

Back to Book
Next Lesson
Post a comment